ঋত্বিক ঘটকের গল্প



ঋত্বিক ঘটকের গল্প

ঋত্বিক ঘটকের গল্প

ঋত্বিককুমার ঘটক





দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

RITWIK GHATAKER GALPA
Collected stories of RITWIK KUMAR GHATAK in Bengali
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
₹ 60.00

ISBN 81-7612-596-2

প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০, মাঘ ১৪০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭

প্রচ্ছদ : হিরণ মিত্র

৬০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল— শেষ হয়ে যাচ্ছিল বাঙালি জীবনের মূল্যমান, পিতার স্নেহ, মাতার মমতা, সংসারের সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধন— য়ুরোপীয়দের মহাযুদ্ধের বলি হচ্ছিল বাঙলাদেশ, ভারতবর্ষ। মন্বন্তর, মহামারী, মৃত্যুর বিরুদ্ধে কতটুকু প্রতিরোধ রচনা করতে পেরেছিল মানুষ? তবু চেষ্টা করেছিল, কিছু প্রাণ-যন্ত্রণায় অস্থির তরুণ-তরুণী দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নানা ছোট বড় সংগঠন গড়েছিল এই শপথ ঘোষণা করে 'আমরা মরব না মরতে দেব না আমাদের ভাই বোনদের'। ঘোষণা করেছিল তাদের গানের দল পথে ঘাটে ট্রামে বাসে; ঘোষণা করেছিল কবিরা কবিতায়, সাহিত্যিকেরা গল্পে উপন্যাসে, সম্মিলিত সাহিত্যে সংস্কৃতির আয়োজনে; মাঠের সভায়, পথের মিছিলে, নাট্যমঞ্চের নাটকে, নৃত্যে।

এদের মধ্যে এসেছিল সেদিনকার অক্লান্ত জীবনশিল্পী ঋত্বিক ঘটক— ধূমকেতুর মতো উজ্জ্বল যার উদয় আর নাতিদীর্ঘ জীবনের সেরূপ অবসান— তবু চলচ্চিত্রের জগৎ সে উদ্ভাসিত করে গিয়েছে তারই মধ্যে। ঋত্বিকের পরিচয়টাই উজ্জ্বলতম ছটায় এখনকার মানুষের প্রাণকে করে তোলে সরসিত ও সঞ্জীবিত। কিন্তু তখনকার আমাদের কাছে ঋত্বিকের অন্য পরিচয়ও ছিল নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিতে স্ফুটনোন্মুখ— কবিতায়, ছোটগল্পে, নাটকে আর কত কাজে, তখনই সে দীপ্যমান— জীবন্ত, অক্লান্ত শিল্পশক্তি শিরায় শিরায় তার উত্তরাধিকার সূত্রে। সে না জানুক তখনও এই প্রতিভাবান পরিবার আমার পরিচিত। ঋত্বিক যখন চল্লিশের মহামানবিক আহ্বানে সব ছেড়ে এসে তখনকার বাঙালির প্রগতিশীল আয়োজনের সঙ্গে দাঁড়াল আমি তাই আশায় উল্লসিত হয়েছিলাম। তার তখনকার গল্প কবিতা নাটক— সেই উজ্জীবন— ঋত্বিকের সকল গল্পের সঙ্গে তবু আমি অবিচ্ছিন্ন পরিচয় রাখতে পারি নি, ক্ষণে ক্ষণে তার অশান্ত, উজ্জ্বল গল্পকর্মের এক-একটি ছটা পেয়ে, দেখা হয়েছে— যেমন *মার, সে, ঝড়ের পাখি*। আবার দেখেছি ঝড় তার শিল্পদৃষ্টিকে অন্ধ করতে পারে নি— *রূপকথা*। কিন্তু সব যে লক্ষ করতে পারি নি। পেরেছি যখন চলচ্চিত্র *অযান্ত্রিক* দেখলাম— তারপর *সুবর্ণরেখা* পর্যন্ত আরও কিছু দেখা সম্ভব হয়েছে— মনে হয়েছে ঋত্বিকের শিল্পপ্রয়াস বহুমুখী হলেও তার প্রধানক্ষেত্র বোধহয় মানুষের প্রতি মমতায় প্রভূততম মানুষকে আপনার কাছে পাবার আগ্রহেই— চলচ্চিত্র। অনেকদিন পরে আজ ঋত্বিকের গল্প হাতে পেয়ে তাই বহু কথা মনে পড়ল— অশান্ত ঋত্বিকের সেই প্রথম আয়োজন অশান্ত সেই যুগের খণ্ডে খণ্ডে চিত্ররচনার উৎসাহ। মনে পড়ল সে কাল, সে উদ্যম উদ্যোগ, আমার ছিয়াশি বৎসরের চোখে আজ ঝাপসা, আর মনে পড়ল সে ঋত্বিককে যে সে কালকে হারিয়ে যেতে দেয়নি— ধরে রাখতে চেয়েছে। এই গল্পগুলি তারই সাক্ষ্য।

আমি বিশেষ আশ্বস্ত বোধ করলাম এই গল্পের সংকলকদের নিষ্ঠায়। নানা পত্রপত্রিকা থেকে যাঁরা এই গল্পগুলি উদ্ধার করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদভাজন— আমাদের শিল্পীদের, লেখকদের অনেক দানই আমাদের শিথিলতায় নষ্ট হয়ে যায়। এই সংকলকদের প্রয়াস দেখে মনে হল, এরূপ সুন্দর ছাপা কাগজে তা সংরক্ষণ করার চেষ্টা বাঙালির পক্ষেও একটা ভরসার কথা, যা নষ্ট হতে আমরা দেব না ॥

গোপাল হালদার
২১শে শ্রাবণ ১৩৯৪

ঋত্বিককুমার ঘটক তাঁর যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে একজন সিরিয়াস সাংস্কৃতিক কর্মী রূপে গড়ে তোলার কাজে মগ্ন হন। এবং প্রগতি-সংস্কৃতির বিকাশে সে সময়ে আরও অনেকের মতো তিনিও ব্রতী হন। শিল্পমাধ্যমের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। এ জন্যেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে তিনি অনায়াস-বিচরণ করতে পেরেছেন।

'গল্পভারতী'-তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যাঁকে একজন শক্তিমান নবীন লেখক রূপে পরিচয় করিয়ে দেন ; সেই ঋত্বিকের সাহিত্যজীবনের শুরু ১৯৪৭-এ রাজশাহিতে প্রকাশিত 'অভিধারা' পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। পরে কলকাতাতেও তাঁরই সম্পাদনায় 'অভিধারা'র কয়েকটি সংখ্যা বেরোয়। রাজশাহিতে প্রকাশিত একটি সংখ্যা এবং কলকাতার একটি সংখ্যা সংগ্রহ করা গেছে। অন্যান্য সংখ্যাগুলো খুঁজে পেলে হয়তো ঋত্বিকের সাহিত্যকর্মে আরও নতুন কিছু সংযোজিত হবে। 'দেশ', 'অগ্রণী', 'শনিবারের চিঠি', 'নতুন সাহিত্য' এবং নানা পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ থেকে দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি কোনো গল্প লেখেননি। কিন্তু সাহিত্য-চিন্তা বরাবরই তাঁর ভিতর ছিল। এজন্যেই দেখা যায় ১৯৬২-র ১০ অক্টোবর তিনি নিজের ছোটোবেলা নিয়ে এক উপন্যাসের ছক করেছিলেন। ১৯৬৫-তে 'পণ্ডিতমশাই' নামে একটি বড়ো গল্প লেখেন। অযত্নে-অবহেলায় তা উইপোকায় কাটে। অবশ্য এই গল্প থেকে তিনি 'জন্মভূমি' নামে যে-চিত্রনাট্যটি করেন তা ১৯৬৮-তে 'অভিনয়-দর্পণে' প্রকাশিত হয়। যে-বিপন্ন জৈবিক সংকট থেকে তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ সেই সাম্য আদর্শের একই মাটিতে ছোটোগল্পগুলোর শিকড়। জীবনের ভাঁজে ভাঁজে দেখা ছবির আত্মমগ্ন অনুভূতি ক্রমশ গল্প হয়ে উঠেছে। তাই গল্পকার ঋত্বিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত জরুরি।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার, গ্রন্থাগারের সাধারণ কর্মীরা এবং ঋত্বিকের সমসাময়িক প্রবীণেরা যেভাবে এই গল্পগুলোকে নিজেদের উদ্যোগে খুঁজে বার করেছেন, পাঠান্তরের বিষয়গুলো যেভাবে সমাধান করে দিয়েছেন এবং এখনও ঋত্বিকের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাপত্র গবেষকের নিষ্ঠায় আবিষ্কারের নেশায় মেতে আছেন— তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন : সমর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত কার্তিক লাহিড়ী রাসবিহারী রায় অনিল সিংহ কালিদাস রক্ষিত ধনঞ্জয় দাস শুভময় গুহ জগন্নাথ গুহ নির্মল দত্ত অশোক মুখোপাধ্যায় কেদারনাথ ব্যানার্জি কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চৈতন্য লাইব্রেরি।

এই বইয়ে সাহিত্য সংসদের বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষে
পল্লবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরমা ঘটক
ঋতবান ঘটক

সূচি

গাছটি

গাঁ থেকে একটু দূরে ছোট্ট নদীর তীরে হুমড়ি খেয়ে-পড়া একটা বট গাছ।

গাছ হিসেবে সেটা খুব ভীষণ কিছু নয়।

বহু পুরোনো গাছ, গুঁড়িটা পোকায় খাওয়া, ডালগুলো পচা। বিস্মৃত কোন সুদূর অতীতে গাছটা ছিল তাজা, আজ নয়। কোনো কাজেই আসত না গাছটা। শুধু গাঁয়ে আসার পথে লোকে চিনত গাছটাকে, জানত এর পরের বাঁকেই আছে হরু কামারের হাপরশালা, তার পর থেকে আসল গাঁ।

বছরে একবার শুধু গাছটার গৌরব বেড়ে যেত। চড়কের সময় ওর কয়েকটা শিকড়কে তেলসিঁদুর দিয়ে কারা যেন চকচকে করে তুলত, দূর দূর গাঁ থেকে লোক আসত। মেলা হত গাঁয়ের মাঠে। তখন হঠাৎ গাছটা দ্রষ্টব্য হয়ে উঠত। তার পর আবার সারা বছরের জন্য গাছটা পড়ে থাকত। আশেপাশে পোড়ো জমিগুলোতে গোরু চরত, কখনো কখনো কোনো দূরাগত পথিক ওর শীতল ছায়াতে বসে পোঁটলা খুলে চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে নদীর জল পান করে আবার রওনা দিত।— জ্যোৎস্না রাতে গাছটি একাকী বিশাল মাঠের ধারে আপন আঙিনায় অপরূপ আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে হুমড়ি খেয়ে পরিবর্তনশীল নদীর জলে যেন কী রহস্যের স্বপ্ন দেখত...

ছটা ঋতু গাছটার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যেত সমানে। নদী দিয়ে নৌকো যেত, ছইয়ের ফাঁক দিয়ে ছোটো ছোটো মুখ অসীম কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে থাকত ওর দিকে।—

ছোটোছেলেদের আড্ডা ছিল ওই গাছতলাটায়। বাঁকাগাছের শাখায় শাখায় ছেলেরা খেলা করত, ডাল থেকে নদীতে ঝাঁপ দিত, ইস্কুল পালিয়ে বসে থাকত।

গাঁয়ের লোকেরা ছোটোবেলা থেকে গাছটার কাছে আসত। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে কেউ কেউ ওর তলায়, শিকড়গুলো যেখানে জটিল হয়ে একটা সুন্দর বসবার জায়গা করেছে, সেখানে বসে নদীর স্তিমিত ছলাৎ-ছলাৎ ধ্বনি শুনত।

ওখানকার জেলেরা জানত ওর তলায় পাড়ের শিকড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাছ পাওয়া যায়— বহু ছোটো-বড়ো মাছ। তাদের ছেলেরা তাই স্নান করতে এসে গামছা ফেলে ধরত মাছ। জাল ফেললেও অনেক মাছ উঠত।

বুড়োলোকরাও একে চিনত। তারা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দেখত ছেলেদের খেলা, জেলেদের মাছ ধরা, আর নিজেদের মনে মাথা নাড়ত। বোধ হয় ভাবত তাদের জীবনের প্রদোষের কথা।

কিন্তু তারা নিজেরাই জানত না তাদের মনে এই বুড়ো বটের জায়গাটা কত বড়ো। তারা ভাবত এটা শুধু বুড়ো-শিবের বট। এটা এখানেই চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। এটা নিতান্তই ছিল—"হরু খুড়্যার মোড় পারায়্যা বুইড়া শিবের বট।"

এবং যতদূর সম্ভব ওটা এখানেই থাকত আরও কয়েক পুরুষ ধরে, আর আশ্রয় দিত আরও কত অনাগত পথিককে। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন কোনো খবর না দিয়েই সরকারি নতুন পরিকল্পনা এসে উপস্থিত হল। বর্তমান সেচ ব্যবস্থার নতুন পরিকল্পনানুসারে আমাদের নদীকে বড়ো করে বহতা করা হবে। অতএব একদিন বহু সাড়াশব্দ করে নিদারুণ আপত্তির সঙ্গে বুড়োশিবের বট মাটিতে পড়ল। নদীর দুই পাড় সমান করে কেটে প্রাচীন নদীকে নয়া-ঢঙের খালে পরিণত করা হল।—

সমস্ত গাঁ একদিনে জেগে উঠল। তারা গাছটার মূল্য বুঝতে পেরেছে। প্রত্যেকের মনেই এল আলোড়ন— তারা মুখ ফুটে জানাল আপত্তি।

কিন্তু তাদের আপত্তি ওই বিড়বিড় করে বকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। গাছটা পড়লই।— তার পর গাঁয়ের লোকে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগল বটটাকে। নতুন মুখ, নতুন বাড়িঘরদোর—সব নতুন। শুধু গ্রামবৃদ্ধেরা যেত যখন ওইখান দিয়ে তখন পাড়টা যেন বড় ন্যাড়া লাগত তাদের চোখে। তাই তারা হাত-পা নেড়ে বর্ণনা করত এ-কথা নতুন লোকদের কাছে। এ তাদের নব-উদয়ন কথা—

কিন্তু, তাই বা ক-দিন!

বটগাছটি এতদিন ধরে এত লোককে আশ্রয় দিয়ে দিয়ে আজ লোকের মন থেকে নিঃশব্দে মুখ বুজে অন্তর্ধান করেছে।

অভিধারা ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ৩১শে ভাদ্র ১৩৫৪ পৃষ্ঠা ১২-১৩

অয়নান্ত

একবেলা

আজ বর্ষা নামিয়াছে। পদ্মার ওপারের ঘননীল মেঘের পটভূমিকায় ছোটো ছোটো ডিঙির সাদা পালগুলি অদ্ভুত লাগিতেছে।

সামনের মাঠ ক্রমে ঝাপসা হইয়া উঠিল। মাঠের ওপারে লাল রাস্তা বাঁকা হইয়া চলিয়া গিয়াছে। একটা বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছ যেন এক পায়ে দাঁড়াইয়া ঝুপসি হইয়া ভিজিতেছে। দু-একটি মজুর মাথায় জলিধানের বোঝা লইয়া যাইতেছে।... সব ঝাপসা, অল্প অল্প বোঝা যায়, কেমন একটা নিঝুম আবহাওয়া চারিদিকে।...

ঘরের মধ্যে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবাদ সম্বন্ধে বলিয়া চলিয়াছেন। শব্দগুলি শুনিতে পাইতেছি কিন্তু মস্তিষ্ক অর্থ গ্রহণ করিতেছে না। বিচিত্র... আর্টস্ বিল্ডিং হইতে কেমিস্ট্রি বিল্ডিং-এর দিকে বৈদ্যুতিক তারগুলি একটু বাঁকাভাবে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের জানালা হইতে তাহার যেটুকু অংশ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৃষ্টিকণাগুলি জমা হইয়া শিশুর মতো চঞ্চলভাবে নিচু দিকে চলিয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে কয়েকটি জলকণামাত্র একত্র হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

তাহারও ওধারে লাইব্রেরি বিল্ডিং-এর ছাদের পরিগুলি ডানা মেলিয়া বর্ষণধারাকে গ্রহণ করিতেছে। একটা হাত-ভাঙা পরি, উহাকে দেখিলেই কেমন যেন মায়া জাগে, নিচু হইয়া কিছু তুলিবার ভঙ্গিতে চুপ করিয়া আছে, ভঙ্গির মধ্যে যেন একটা অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।... জানালার শার্শিতে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া লাগিতেছে। বিন্দুগুলি গড়াইয়া পড়িতেছে, শার্শিটা ঝাপসা হইয়া উঠিল। বর্ষার রিমঝিম ধ্বনি মনের মধ্যে একটা মাদকতার সৃষ্টি করে।

আশ্চর্য, আজ আমার মনে একটা তন্দ্রাগত অবস্থা, একটা করুণতা জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। কী যেন ছিল, আজ নাই, কোথায় কী যেন হারাইতেছি... মনে হয় কালস্রোত আমাকে, আমার সহিত এই বিশ্বটাকে কোন সাগরসংগমে মিলাইবার জন্য টানিয়া লইয়া চলিতেছে, যেন কোনো স্রোতে ভাসমান ব্যক্তি, নিকটেই তাহার তটরেখা, প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। বালুর উপর শুধু পাঁচ আঙুলের ছাপ থাকিয়া যায়, নিরুপায় তাহাকে স্রোতস্বতী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে...।

ঘরের মধ্যে অধ্যাপকের মৃদুগম্ভীর বাক্যস্রোত, বাহিরে নবীন মেঘের ডাকাডাকি। দূরে তালপাতার উপর বৃষ্টি ঝরার শব্দ, একটা ভিজা পারাবত ছাদের কার্নিশে বসিয়া ক্রমাগত ডানা ঝাপটাইতেছে। মনে আমার অদ্ভুত চিন্তার দল ভিড় করিয়া আছে। এদিকে এই বর্ষার অরুন্তুদ ক্রন্দন আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মাথার মধ্যে কেমন যেন হইয়া আছে, কিছুই ভালো লাগিতেছে না। সমস্তই অসার, কোনো কিছুরই চরম কোনো লক্ষ্য নাই, সব অন্ধবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে... এইসব চিন্তা মাথায় পাক খাইতেছে।... মনে পড়ে

দার্শনিকের তত্ত্বকথা, যেখানকার যাহা, তাহাকে সেখানেই থাকিতে দাও, অন্যস্থানে লইয়া কোনো পরম লাভ নাই। আজ মনে হয় ইহা সত্য। অনেক জিনিসকে যথাস্থানে রাখিলে অনেক জটিলতা, অনেক পরিশ্রমের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত।...

বৃষ্টি ধরিয়াছে, রাস্তার স্থানে স্থানে জল জমিয়া আছে, অসম্ভব কাদা। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস গাছের পাতা নড়াইয়া ক্ষণবৃষ্টির সৃষ্টি করে। রোদসী আকাশ তেমনই মুখ ভার করিয়া আছে। মেঘগুলির আকার নাই, সমস্ত আকাশটিতে কে যেন মাটি লেপিয়া দিয়াছে।...

লক্ষ্যহীনভাবে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাড়ি যাইতে ইচ্ছা নাই ; পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে পদ্মার ধারে গিয়া বসিলাম। আকাশ ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিল, সূর্যের রক্তরশ্মি দুইশত বৎসরের পুরাতন নীলকুঠির দেওয়ালে আবির মাখাইয়া দিয়াছে।... দেওয়ালে নোনা লাগিয়া কতকগুলি সাদা-কালো দাগের সৃষ্টি করিয়াছে। মনে পড়িতেছে, ছোটোবেলায় একবার জ্বর হইয়াছিল। সেও এমনি বর্ষাকাল, বাহিরে জোলো বাতাসের স্বনন... লাইব্রেরির মাঠের তাল গাছটা ক্রমাগত মাথা নাড়িতেছে আর নাড়িতেছে। ঘরের মধ্যে বিছানার পাশে দেওয়ালের এমনি নোনা-ধরা দাগগুলিকে ঘিরিয়া কত বিচিত্র কল্পনা।...

হঠাৎ চমক ভাঙে। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ওপারের কাতলামারীর চর অস্পষ্ট হইয়া উঠে।

শহরের ঘরে ঘরে জাগে আলোকের রেখা। অহেতুক দীর্ঘশ্বাসের সহিত বাড়ির দিকে চলি।...

মাথা কেমন টিপ টিপ করিতেছে। মুখের ভিতর একটা বিস্বাদ ভাব। আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াই। নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে আজ ভালো করিয়া তাকাইলাম। একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের ছেলে, চোখে উন্মনা দৃষ্টি। একহারা, রোগাই বলা চলে। মুখে একটা ক্লান্ত আর্ত ভাব। আধময়লা একটা টুইলের শার্ট গায়ে। নিতান্তই সাধারণ একটি ছেলে। লম্বাটে মুখে কোনো অতিমানবত্বের ছাপই লাগিয়া নাই।

আয়না হইতে সরিয়া আসি।— মনের এ-অবস্থা আমার প্রায়ই হয়। একেক দিন বিচিত্র যত চিন্তা ভিড় করে মাথায়।... আজও খালি মনে হইতেছে, কোথাও চলিয়া যাই, যেখানে শুধু প্রকৃতি— বিশাল মানস সরোবরের তীরে যেখানে হংসবলাকা বসন্তের প্রাক্‌কালে নীলনদের অববাহিকার সুখনীড় ত্যজিয়া বহু গিরিনদী সাগর পার হইয়া বাস করিতে আসে, যেখানে ধবলচূড় কৈলাসের অঙ্গ বাহিয়া তুষার নদী চলে মন্দপ্রয়াতে...

খাইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘরের মধ্যে বোধ হয় দিদি একগুচ্ছ হাসনুহানা রাখিয়া গিয়াছে। গন্ধের অপূর্বকুহকে ঘরটি আছে ভরিয়া। একটি অপূর্ব পূত পবিত্র গন্ধ...।

বৃষ্টি নাই। জানালাটা খুলিয়া দিলাম, এক ঝলক স্মিত চন্দ্রালোক তির্যকভাবে বিছানায় ছড়াইয়া পড়িল। ঘরের মৃদু সেজটি নিভাইয়া দিলাম।... বাহিরে অপরূপ রাত্রির সেই চিরন্তনা প্রকৃতি, ছলনাময়ী, কৌতুকপ্রিয়া।—দুটি জল ভরা মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠিয়াছে... দূরে ঝিল্লির একটানা শব্দ... the poetry of earth is never dead...

বহুদিন আগে 'ভারতবর্ষ' না 'প্রবাসী'তে দেখা একখানি ছবি, বোধ হয় দেবীপ্রসাদের আঁকা... 'বর্ষার চাঁদিনী' আজ তাহাই যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

হাতটি জানালায় রাখিলাম, বাহিরের জ্যোৎস্নায় ফুটিয়া উঠিল একটি হাতের ছায়াছবি। অকারণে মনে হইল, আমার এ-হাতটি কতরকমে একসঙ্গে বর্তমান থাকিতে পারে। যখন ভাবা যায়, আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয় কতরকমে একটি হাত থাকিতে পারে। এবং যত ভাবা যায় ততই সমস্ত আবছা ও রহস্যময় হইয়া যায়। যাহা সহজ ও বোধগম্য, বেশি তলাইয়া দেখিলে অবোধ্য হইয়া উঠে। মনের মধ্যে রহস্য ফেনিল হইয়া উঠিল, যেন ভূকম্পে পায়ের তলার মাটি সরিয়া যায়। এসব চিন্তায় মনে কেমন অনিশ্চয়তার ভাব আনিয়া দেয়, চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে। তবু আমার মনের বিশ্বাস, যদি কেহ বহুদিন ধরিয়া ও একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে থাকে, বোধ হয় কোনোরূপে এই অস্পষ্টতার অপর দিকে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু ঠিক কীসে? ইহাই প্রশ্ন। যদি কেহ স্বাধীন হইতে পারে, আমার কেমন মনে হয়, এই রহস্যলোকে আলোকসম্পাত করা যায়। কিন্তু প্রধান বাধা এই দেহ, যাহা পশুত্বের প্রধান পরিচয়, এ দুর্বল দেহ সে কৃচ্ছ্রসাধনের সম্মুখে ভীরু কাপুরুষ হইয়া যায়।—

ভালো করিয়া আবার হাতের ছায়ার দিকে চাহিলাম। মনে হইল ইহা কেবলমাত্র একটা আকার এবং আলোর আসার পথে বাধামাত্র। একটি জ্ঞানহীন ছোটো শিশুর নিকট তাহাই মনে হইবে। কিন্তু যদি আমি পদার্থতত্ত্ব গবেষক হইতাম, আমাকে কল্পনা করিতে হইত প্রায় ধারণাতীত সংখ্যক অণুকণার, যাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কতকগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ পরমাণু, একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎপরমাণু নিউক্লিয়াসকে মিনিটে লক্ষ লক্ষ বার প্রদক্ষিণ করিতেছে। উপরের অণুগুলি বৈদ্যুতিক চৌম্বক বিকর্ষণের সাহায্যে শুধু সেই আলোক তরঙ্গগুলিকেই ঠেলিয়া দিতেছে, যাহা আমাদের চোখে হাতের রং বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। অণুগুলির ভিতর পরমাণুরা ক্রমাগত কক্ষপথ বদল করিতেছে, অথচ তাহাতে কোনো সময় লাগিতেছে না বা জায়গা বদল করিতেছে না। একটি অণুর ভিতর সত্য সত্যই স্থান বা কাল বলিয়া কিছু নাই! এ যে কী তাহা আমার ধারণায় আসে না, সত্য বলিতে কী আমি এসব কিছুই বিশেষ বুঝি না। কিন্তু পাগল হইবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

আবার রাসায়নিকের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে এই সমস্ত অণুগুলি কয়েকটি পরমাণুতে গঠিত, উহারা আবার নিউক্লিয়াসের চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছে। সংখ্যা অনুসারে ইহারাই নানা **element**-এর **molecule** গঠন করে। যদি আমি আমার এই দক্ষিণ হাতটি আগুনে বাড়াইয়া ধরি, **molecule**-গুলি আবার অণুতে বিভক্ত হইয়া যাইবে।

একজন জীবতত্ত্ববিদ আমার এই হাতে অগণন কোষের কল্পনা করিবে, কোষগুলি প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য করিয়া যাইতেছে। কখনো এ উহার পথে পড়ে না, ভুল করে না। শুদ্ধ জন্মাইতেছে, বাঁচিতেছে, নূতন কোষের জন্ম দিতেছে, প্রত্যেকের চেষ্টা ইহাদের সকলের দ্বারা গঠিত এই যন্ত্রটা যাহাতে সুচারুরূপে কাজ করিয়া যায়, যেন ইহারা কোনো পূর্বগঠিত পরিকল্পনানুসারে কাজ করে। যদি হাতটি পুড়ে, ক্ষতের চারি দিক হইতে সুস্থ কোষগুলি নূতন কোষের জন্ম দিয়া ক্ষত ঢাকিয়া দেয়...।

এইরূপে বহুভাবে এই হাত, যাহা বাহিরের পাংশু চন্দ্রালোককে বাধা দিতেছে, একই সঙ্গে বহু জগতে বিরাজ করিতেছে। ইহা বৈদ্যুতিক শক্তিরূপে ; রাসায়নিক molecule রূপে ; জীবন্ত কোষরূপে ; ভালো ও মন্দ করিবার যন্ত্ররূপে ; এই বস্তুজগতে এবং আমার মনের মধ্যে এই মুহূর্তেই বর্তমান আছে, এবং ইহা হইতে প্রশ্ন জাগিবেই, এই যে বহুরূপে বর্তমান থাকা ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র কোথায়?— প্রাণের স্পন্দন ও রসায়নের মধ্যে কী মিল ঘটাইতেছে?— এই জায়গাতেই সেই রহস্যময় গভীর কৃষ্ণফেনিল সমুদ্র। এখানে কোনো মিলন-শৃঙ্খলই নাই, থাকিলেও আমি অন্তত পক্ষে দেখিতে পাইতেছি না।— বিশাল বিশ্বের উপর আর এক বিশ্ব, স্তরের উপর স্তর, প্রত্যেকটি একেবারে স্বতন্ত্র... একটির যাহা সত্য, অন্যের কাছে তাহা নাই-ই, অথচ প্রত্যেকেরই বর্তমান থাকার সমান অধিকার, প্রত্যেকেই সত্য। একজনের পরিভাষায় আর একজনকে বোঝানো যায় না, মনকে রসায়ন বা পদার্থ বলা চলে না, এটুকু স্পষ্ট বুঝি।

কিন্তু এ সকলের মধ্যে সেই রহস্যসূত্র? বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়, যদি কেহ গভীর চিন্তা করে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বোধ হয় সত্য সত্যই সবই মন বা আত্মা, বাকি সব মায়া, শুদ্ধ বাহিরের প্রভেদ।— কিন্তু অনন্যমনে বহু বৎসর চিন্তার পূর্বে এ-কথা বলার কাহারও অধিকার নাই। মন শান্ত, তপোক্লিষ্ট হওয়া চাই। স্বাধীনভাবে ছাড়া পরিষ্কার চিন্তা অসম্ভব। মনকে উদার ও উন্মুক্ত রাখা চাই, তিতিক্ষা চাই।— অবশ্য এসবই আমার নিজের ধারণা, কোনোদিন পরীক্ষা করি নাই, তবু বোধ হয় এমনটিই হইবে।—

মস্তিষ্ক চিন্তা করিয়া চলে। আমাদের সেই ক্লাসরুম হইতে জানালায় দেখা তারের অংশটুকু, তাহার উপর পরস্পর পশ্চাদ্ধাবমান জলবিন্দুর দল... নীলকুঠির নোনা-ধরা দেওয়াল, লাইব্রেরির ছাদের সেই হাত-ভাঙা পরিটি, কাতলামারীর চর... তুচ্ছ ঘটনার দল আমার মস্তিষ্ক ঘিরিয়া আবর্তন করিয়া চলিয়াছে।

ধীরে ধীরে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

মধ্যরাত্রে একবার ঘুম ভাঙিয়াছিল, বাতায়ন দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে।... জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে পড়ে সেই পদ্মাপারের মেঘগুলির কথা। অদ্ভুত আকারের সব বাড়িঘর... শঙ্খঘণ্টা-পূজাধূম... জনগণের কলকোলাহল... তাহারও ওপারে আকাশে অঙ্গ হেলাইয়া পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি ; সব কেমন কুহেলিমাখানো ধোঁয়া ধোঁয়া।... ঘরের মধ্যে হাসনুহানার চাপা গন্ধের আমেজ... বাহিরে বারিপাতের ঝুপ ঝুপ আওয়াজ, কোনো গাছের উপর নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন... কোথায় যেন ব্যাং ডাকিতেছে, পাশের বাড়ির খোকার অর্ধগত ক্রন্দন। পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

অশান্ত

সকালে চুপ করিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি। রঞ্জন ও কপিল হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত।

রঞ্জন অদ্ভুত ধরনের ছেলে। উজ্জ্বল গৌর রং, চোখ দুটি বড়ো বড়ো। সমস্ত মুখে একটা কেমন শান্ত ভাব, চোখে বুদ্ধির প্রাখর্য। উহাকে দেখিলেই কেমন একটি ভাব আসে, মনে হয় যেন কোনো আজীবন ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকারী যোগীর সান্নিধ্যে আসিয়াছি। কথা বলে কম, কিন্তু প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়া বলে। হাজার লোকের মধ্যে থাকিলেও নজরে পড়ে। অচেনা লোকে সমীহ করিয়া কথা বলে।— আর কপিল! শ্যামল গাত্রবর্ণ, চুলগুলি বড়ো বড়ো, সর্বসময়ে তরল মনেই আছে। একবার আরম্ভ করিলে অনর্গল কথা বলিয়া যায়, পৃথিবীর সর্ববিষয়ে উহার নিজস্ব মতামত আছে। তাহা প্রচার করার জন্য চেষ্টারও সীমা নাই।— দুজনে কিন্তু কত পার্থক্য সত্ত্বেও অভিন্ন বন্ধু। উহাদের জগৎ যেন একটি বিরাট উৎসব সভা, একটা-না-একটা লাগিয়াই আছে। প্রত্যেকটিতে যোগ দেওয়া চাই, নহিলে কোথায় সর্বস্বহানি হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন করিলাম— 'এমন অসময়ে একেবারে জোড়ে আবির্ভাব যে?'

রঞ্জন জবাব দিল— 'আজ বিকেলে ৭টায় কমনরুমে স্বামী সহজানন্দজী বক্তৃতা দেবেন, তুই কিন্তু যাস। একটু সকালেই যাস তুই, কারণ আমরা দুজনেই মোটে organiser, help করতে হবে।

বলিলাম—'বেশ, যাব আমি'।

কপিল হঠাৎ কহিল, 'বিনু, তুই ভাই রঞ্জনের সঙ্গে কথা বল। আমার আবার অন্য জায়গায়'— কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই বাহির হইয়া যায়। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা। রঞ্জন চুপ করিয়া কোলে হাত রাখিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে।... একটা ছোটো চড়ুই আমার জানালার সামনে নামিয়া আসিল, ঘাস হইতে কী যেন খুঁটিতেছে। জাম গাছটার গায়ে একটা কাঠঠোকরা অনবরত আওয়াজ করিয়া চলিয়াছে। দূরে কোনো বাড়িতে একটি ছেলে সুর করিয়া পড়িতেছে। সমস্ত শহরটায় কোনো কোলাহল নাই...।

রঞ্জন কহিল— 'তোর কী হয়েছে?' চমকাইয়া কহিলাম, 'কেন?'

—'তোর কেমন একটা ভাব, সবই শুনছিস, কিন্তু অন্যমনস্ক, কথাও কীরকম করে বলছিস'—

বলিলাম— 'মনে বড়ো অশান্তি নিয়ে আছি আমি।' ও বলে, 'নিতান্ত গোপনীয় না হলে কারণগুলো বলতে পারিস।' ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না বলিব কি না। আমার গোপন চিন্তা ও কেমনভাবে লইবে কে জানে। এ যেন ঠিক কোনো লাজুক মেয়েকে নাট্যমঞ্চে উঠিতে বলা। বড়ো সংকোচ হইল প্রাণে।—

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলাম— 'আমার এমন আগেও হয়েছে, কাল আবার ভাবটা ফিরে এসেছিল। কী রকম একটা অবস্থা, মনে হয় যেন এই পৃথিবী, তারা, গ্রহ, আকাশ সব যেন একটা স্রোতে ভেসে চলেছে।... শীতকালে শিলং গেছিস?— ওখানকার লোকে বলে শীতে জলের উপর একটা বরফের আস্তরণ পড়ে যায়। বড়ো মানুষের দল প্রমোদবিহারে এসে সেখানে স্কেটিং করে। পাতলা একটা

স্তর, তার নীচে কালো গরম জল।... আমরাও যেন এ-বিশ্বে ওই ওপরের আস্তরণটায় ঘুরছি, কখনো শুভ্র স্তরের তলের বিশাল জগৎটার কথা ভাবিই না। মনে হয় একটু চেষ্টা করলে এই স্তরটা ভেঙে ফেলা যায় ; তখন তলার জগৎটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সব জিনিসেরই...'

ক্রমশ কণ্ঠ সাবলীল হইয়া আসে, একটা নির্ভরতার সঙ্গে বলিয়া চলি— 'সব জিনিসেরই ওপরের রূপটাই দেখি আমরা। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, এই জগৎ ছাড়া আর কিছুর কল্পনাও এখন নিষিদ্ধ।... তবু মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো ঘটনা আমাদের তার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার জীবনে এমন কতবার ঘটেছে ;— এসব কথা যতই ভাবি মাথা কেমন গুলিয়ে আসে...। আমার কিন্তু তথাপি ধারণা, যদি খালি ভাবা যায়, আর সব ছেড়ে ভাবা যায়... দিনরাত, বছরের পর বছর, তবে বোধ হয় এই পর্দার ওপারে দেখা যাবে।'...

ঘরের মধ্যে আমার কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, হঠাৎ থামিয়া যাওয়ার দরুন নিজের কাছে নিজের স্বরই কেমন বিসদৃশ লাগিতেছে। রঞ্জন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছে। বাহিরে টিপ টিপ বৃষ্টি। রাস্তায় কাহারা যেন কথা কহিতেছে। আবার কথাটা আরম্ভ করিলাম— 'একটা কথা আমার কেবলই মনে হচ্ছে কদিন থেকে। শুনলে খাপছাড়া মনে হবে বটে, কিন্তু এই প্রকৃতির মধ্যে একটা মাদক রস আছে। যে একবার সে-রসের সন্ধান পেয়েছে, তার আর নিস্তার নেই। এই প্রকৃতি তাকে নিজের মধ্যে একেবারে লীন করে ফেলবে। এর বিভিন্ন ঋতুর রূপ ; বসন্তের ঔজ্জ্বল্য, গ্রীষ্মের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের শব্দময় নিস্তব্ধতা, বর্ষার অবিরাম ধারাবর্ষণের শব্দ, শরতের সোনালি মাঠ, ছেঁড়া মেঘে-ভরা গভীর নীল আকাশ, হেমন্তের ঘাসের ডগার শিশির পড়ে ভোরের আলোয় চকচক করা শীতের সর্বস্বরিক্ত-বিবাগি হয়ে-যাওয়া উদাসীনতা ;... পাগল হয়ে যাব আমি! তবু এখানেও সেই একই প্রশ্ন, এক প্রকৃতির ভিন্নরূপের ভেতরকার সত্যটা কোথায়?—'

যেমন আরম্ভ করিয়াছিলাম তেমনি অকস্মাৎ থমকিয়া চুপ করিলাম। রঞ্জন সেই একইভাবে বসিয়া কোলের উপর হাত, মাথাটি ঈষৎ হেলানো, চোখে তন্দ্রাচ্ছন্নের মূঢ়তা।— ও কী ভাবিতেছে কে জানে। আশ্চর্য, আমার মনের চিন্তা উহার মনেও সঞ্চারিত হইয়া গেছে। আমার এই কণ্ঠনালির বিভিন্ন যন্ত্রের সমবেত কার্যের ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গ পারাপারহীন অনন্ত শূন্যতার মধ্যে এতটুকু স্থানকে আলোড়িত করিল, সেই তরঙ্গদল বিভিন্ন যন্ত্র-সাহায্যে উহার মস্তিষ্কে নীত হইয়া উহার মধ্যে যে-বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল, তাহারই ফলে উহার সুপ্ত চিন্তাধারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে... আমার চিন্তা আমি উহার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছি। মানুষ, সর্বাপেক্ষা জটিল যন্ত্রে গঠিত মানুষ, সেই শুধু তাহার বহু যুগের চিন্তাশক্তির বলে একজন আর একজনের মনে নিজের চিন্তা প্রবেশ করাইয়া দিতে পারে। একমাত্র এই জন্যই মানুষ মরে, তাহার ভাবধারা থাকে অবিনশ্বর হইয়া কল্পকালের জন্য এবং একমাত্র এই জন্যই মানুষ গল্প লেখে, কবিতা গাঁথে, গাথা গায়... কঠিন শিলাস্তূপের বুকে কঠিনতর অস্ত্রের দ্বারা রাখিয়া যায় স্তব্ধ চিন্তাস্রোত...। এই প্রবৃত্তির দরুনই আমরা আজ জানিতে পারি হাজারো বছর আগে কাহার কী দেখিয়া কী মনে হইয়াছিল।...

সচকিত হইয়া শুনিলাম, রঞ্জন বলিতেছে, 'গৌতম কতদিন বোধিদ্রুমের তলে বসে চিন্তা করেছিলেন জানিস?'—কহিলাম, 'ঠিক মনে পড়ছে না আমার। খুব সম্ভব বারো বছর।'

রঞ্জন খুব ধীরে ধীরে প্রত্যেক শব্দে জোর দিয়া পুনরুক্তি করে— 'বারো বছর!'—

খানিক সময় কাটিয়া যায়। রঞ্জন নিজের মনে বলিয়া চলিল।

— হে ধরণী, কেন প্রতিদিন তৃপ্তিহীন,
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে...

আমি নির্বাকভাবে রঞ্জনের দিকে চাহিয়া রহিলাম। রঞ্জনের মুখে চোখে একটা অদ্ভুত দীপ্তি... কীরকম অস্বাভাবিক লাগিতেছে। ও সশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে— 'যাকগে আমি চললাম, বেলা হয়ে গেছে। তুই কিন্তু যাস সময়মতো।' ও বাহির হইয়া যায়। স্থাণুর মতো খানিক বসিয়া থাকি ; তাহার পর উঠি আমি।

দিদি বাড়ির ভিতরকার ছোটো মাঠে একটু বাগানমতো করিয়াছে। আমি রোজ স্নানের আগে ফুলগাছগুলিতে জল দিই। আজও জল দিয়া আসিয়া ঝারিটি নামাইয়া কুয়ার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। অদূরে একটা ভাঁট ফুলের গাছ। একগাদা ফুটিয়া আছে। বাতাসে একটা তীব্র মিষ্ট গন্ধ...।

মনে পড়িতেছে কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন... 'এই পৃথিবীটা ভোগের স্বর্ণলঙ্কা, বন্দিনী সীতার মতো নিখিল মানব মন, রাক্ষস অবিরত ফুসলাইয়া চলিয়াছে... আর এই ফুলের দল, তাহারা শ্রীরামচন্দ্রের দূত, তাঁহার অভিজ্ঞান দেখাইয়া স্মরণ করাইয়া দেয়, এ পুরী বন্ধন পুরী, ইহার বাহিরে আছে মুক্তি ; আশ্বাস দেয়, এই দুঃখের মধ্য দিয়া আমরা অধিকারী হইব সেই আনন্দরূপম অমৃতম্-এর।... বাহিরের জগতের খবর এইসব আরণ্য ফুলের দল লইয়া আসে, ইহারা সেই সেতু, আমরা জাগরিত থাকিলে তাহাদের বার্তা গ্রহণ করিতে পারি। বুঝিতে পারি এই সোনার দানবপুরীটাই সব নয়। ইহার বাহিরে আছে বৃহত্তর জগৎ। সেইখানে আমাদের প্রেমের সাফল্য, আমাদের জীবনের চরিতার্থতা...।'

এই যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ সব জিনিস, উহারা এক-একটা কবিতার টুকরা। এই ভাঁটগুচ্ছ... তারের ভিতর দিয়া চলমান জলবিন্দুর দল... শ্রাবণ রাত্রের তালপাতার উপর ক্লান্তিহীন জলঝরার শব্দ... ঝিল্লির একটানা সুর... আমাদের অন্তরতমকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। আমাদের মনে যে-ভাব আসে ইহাদের প্রত্যক্ষ করিয়া সে ভাব জাগে শুদ্ধভাবে গীত গৌড়মল্লার-এর স্বরগ্রামের মধ্যে...। কেমন একটা ভাব, সময়ের বাধা পার হইয়া মন চলিয়া যায়— সেই যেখানে কেতকীর বেড়া-ঘেরা উপবন ছিল, বর্ষার প্রারম্ভে যেখানে গৃহবলিভুক পাখিরা গ্রাম চৈত্যের উপর নীড় বাঁধিতে মহাব্যস্তভাবে আনাগোনা করিতেছিল, গ্রামের প্রান্তে মেঘের মতোই কালো পক্ক জম্বুবনের ফল খাইতে ভল্লুকের দল পাহাড় হইতে নামিয়া আসিত। সেই যেখানে গ্রামবৃদ্ধের দল উদয়ন কথা বলিত, জনপদবধূরা ভ্রূবিকারানভিজ্ঞ, হর্ম বাতায়ন পথে কুন্তল-সংস্কার-ধূপের গন্ধ উড়িয়া আসিত, ভবন শিখরে অন্ধকার রাত্রে গৃহপারাবতেরা দল বাঁধিয়া ঘুমাইত— সেই নীচৈঃ, দশার্ণ, বিদিশা, শিপ্রা, যেখানে শঙ্কর দুই হাতে রক্তাক্ত জীন লইয়া তাণ্ডবে মত্ত

হইয়াছিলেন...!

...ধীরে ধীরে ইঁদারার পাটে বসিয়া পড়ি।

সভায় ও অন্যত্র

বিকালবেলা। কলেজ কমনরুমের সম্মুখে তেঁতুল গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছি। স্বামী সহজানন্দ এখনও আসেন নাই, তাঁহার কাছে কপিল গিয়াছে। লোক এরকম সভার আন্দাজে মন্দ হয় নাই।—

আকাশ গাঢ় নীল। আজ যেন শরতের একটি দিন ছিটকাইয়া আসিয়াছে। ছেঁড়া সাদা মেঘের আনাগোনা। দ্বিপ্রহরের প্রথম দিকে খুব বর্ষণ হইয়া গিয়াছিল। ঘাসে, পাতায় জল সূর্যের কিরণে চকচক করিতেছে। সবই আনন্দময় লাগিতেছে। কতকগুলি ছেলে আসিয়া আমাকে পাকড়াও করিল। তাহাদের সহিত অত্যন্ত বাজে এবং তুচ্ছ কথাবার্তা কহিতে করিতে আমি অন্যদিকে চলিয়া যাই। আলাপ-আলোচনা, ঠাট্টা-রসিকতা, চিৎকার-হট্টগোলে স্থানটি ভরিয়া গেছে।

এই মানুষ। আর ওধারে সূর্যের আলোয় মেঘগুলির রাঙিয়া ওঠা, তেঁতুল গাছটার উপরে ছোটো ছোটো পাখিদের মহাব্যস্তভাবে আনাগোনা... প্রকৃতি নীরবে তাহার সৌন্দর্যের ডালায় একটি একটি করিয়া ফুল সাজাইয়া চলিয়াছে, কে দেখিল, না দেখিল, তাহার কোনো ভ্রূক্ষেপই নাই—

'এরকম রৌদ্রে আমার মন ভারি উদাসীন হইয়া যায়। ইহার কী যে মানে, খুঁজিয়া পাই না, ইহার সঙ্গে কী যে আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে, ঠিক বুঝিয়া পাই না। যেন ইহা এই বিশালা ধরিত্রীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। মনে হয়, কোন সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সহিত এক হইয়াছিলাম, তখন অব্যক্ত অর্ধচেতন একটা জীবনীশক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকিত, তাহাই মনে পড়ে। এ মনের ভাব আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার চেতনার প্রবাহ ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত প্রকৃতির গোপন অভ্যন্তরে জীবনের আবেগ কম্পমান।'— ধরিত্রীর প্রতি আমার একটি অত্যন্ত ঘন আত্মীয়তার ভাব আছে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না, কারণ এই মুহূর্তে যাহারা আমার সহিত ঘুরিতেছে, তাহারা ইহাকে কিম্ভূতরকমের একটা কিছু ভাবিয়া লইবে। আমার মর্মবাণী যদি বাহির হইতে আঘাত পায়, সহ্য করিতে পারিব না আমি।

—হইহই করিতে করিতে স্বামীজিকে সঙ্গে লইয়া কপিল আসিয়া পড়িল। দূর হইতে স্বামীজিকে দেখিলাম। শুনিয়াছি ইনি নাকি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। এবং বহুদিন আমেরিকায় বাস করিয়াছেন। ছোটো বেঁটে খাটো মানুষটি, প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। সুপুরুষ কোনোমতেই বলা চলে না, তবু একটা কিছু তাঁহার মুখে ছিল, যাহাতে তাঁহাকে দেখিলেই ভালো লাগে। সর্বদাই হাসিতেছেন।—

সভা আরম্ভ হইয়া গেল। স্বামীজি গীতা হইতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন... অস্পষ্ট কানে আসিতেছে দর্শনতত্ত্বের সব বড়ো বড়ো কথাগুলি।— ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম, টিকিতে পারিলাম না আমি। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াই।...

বহুক্ষণ কাটিয়া যায়! ক্রমে সন্ধ্যা নামিয়া আসে। সামনের পুকুরে পাতিহাঁসের দল সমস্ত বিকাল ডুবিয়া ডুবিয়া গুগলি তুলিতে ব্যস্ত ছিল, উঠিয়া হেলিতে দুলিতে রাস্তা ধরিয়া রওনা দেয়।— রাস্তা দিয়া গোরুর দল ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে, একটা রাখাল বালক, হাতে পাঁচনবাড়ি, তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।...

সভা ভাঙিয়াছে। লোকজনের চিৎকার, চেয়ার বেঞ্চির শব্দ। স্বামী সহজানন্দ বাহিরে আসেন। কপিল ও রঞ্জন উঁহাকে উঠাইয়া দিতে যায়। অপর একটি ছাত্রের সহিত... স্বামীজি গাড়ি করিয়া চলিয়া যান।... ক্রমে শ্রোতার দল বিদায় লয়, কমনরুম খালি হইয়া আসে। রঞ্জন ও কপিল ফিরিয়া আসে।—

এখানকার কাজ মিটাইয়া আমরা রওনা দিলাম। রাত্রি বোধহয় আটটা বাজিয়াছে। পথে লোকজনের ভিড় নাই।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ চলা। হঠাৎ কপিল বলিল, 'রঞ্জনের কাছে সব শুনলাম। তোকে জানতাম নিতান্তই একটি সাধারণ ছেলে, তোর কথাবার্তা থেকে ঘুণাক্ষরেও কেউ আঁচ করতে পারবে না তুই এমন গর্দভ। একেবারে গোড়ার কথা জিজ্ঞেস করি কী চাস তুই, নির্বাণ?'

উত্তর করিলাম 'নির্বাণ-টির্বাণ চাই না ভাই, এমনি কতকগুলো কথা মনে বড়ো জাগছে, উত্তর খুঁজছি আমি।'

আবার নীরবে খানিক পথ চলি। আলাপের সূত্র ধরিয়া কপিল আবার বলে— 'তুই কীভাবে তোর সন্ধান চালাতে চাস বল।'

বলিলাম— 'আমার মনে হয় দিনের পর দিন, বছর বছর ধরে ভেবে গেলে তল পাওয়া যায়। আমি ভাবছি কিছুদিন আমাদের গ্রামের বাড়ি গিয়ে থাকব। সেখানে বসে শুধু চিন্তা করব। এক বছর, দু-বছর, তাতে না হয় যতদিন লাগে ; এখানে থাকলে হাজার রকমের বাধাবিপত্তি, ওখানে গ্রামে থাকলে বাইরের বাধাটা কম হবে।'

'কিন্তু এভাবে পালানোটা কাপুরুষতা'— ও তর্ক তোলে— 'কারোই কোনো অধিকার নেই, যাকে শতকরা নিরানব্বুইজন লোক বাস্তব বলে মনে করে, এভাবে তাকে অবহেলা করার।'

'কেন নেই'?—বলি আমি—'একজনের সাড়ে ছ-ফুট লম্বা হবার, চুয়ান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি করার অধিকার আছে। প্রত্যেকেরই সে-অধিকার আছে, যদিও লাখে তা একজনের হয়। তবে কেন একজনের অদ্ভুত চিন্তাশীল মন নিয়ে জন্মাবার অধিকার থাকবে না— যে-মন সমস্ত জিনিসের ওপরটা দেখে ক্ষান্ত হয় না?'—ও বলে ;— 'তবে যাকে এই কোটি কোটি লোক নির্বিচারে মেনে নিচ্ছে, তারা সব মিথ্যা হয়ে গেল?'.

উত্তর করি—'তা কেন?— মুক্তিলাভের, সত্যকে জানবার হাজারো উপায় আছে। যার যেরকম ইচ্ছে সে তেমনভাবে সাধনা করতে পারে, সে যাকে সত্যি বলে ভাবে তাই তো সত্যি! এ নিয়ে কোনো তর্কই উঠতে পারে না। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন :

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'।

এঁরাও আছেন। তবে আমার পথ এঁদের থেকে স্বতন্ত্র, ব্যস!' এতক্ষণ রঞ্জন চুপ করিয়া হাঁটিতেছিল। এতক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিল :— 'তুই একটা নিজের মনগড়া জগতে বাস করছিস, বাইরের থেকে আঘাত যেদিন আসবে, সেদিন তোর জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'—

'সে আঘাত আসবে না বলেই বিশ্বাস করি আমি। আর যাতে তা না আসে তার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।... তোমরা বোধ হয় আমাকে একটা অলস বলে মনে করছ। ভাবছ, সমস্ত পৃথিবীটা যখন কাজ করবে, দিবাস্বপ্নে মেতে থাকব আমি। আমি সে কথাও ভেবেছি।' একটু হাসিয়া ও থামে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে থামি।

'মুশকিল এই যে, আজকাল সবার ধারণা যে কাজই হচ্ছে সবার উপরে, আর কাজের চিন্তা ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তারই কোনো মূল্য নেই।' আবার চলা শুরু হয়।

'তাদের জন্য হাজারোটা পথের নিরানব্বুইটাই রইল।— আর আমি যদি দেখি যে এ পথ আমার নয়, অন্য পথ নেব। কাজই করব আমি, কিন্তু এখন পর্যন্ত ও পথে খুব আলো দেখি নি, সত্যি বলতে কি। অবশ্য চেষ্টাও বিশেষ করি নি :—'

রঞ্জন আবার কথা বলে ধীরে ধীরে— 'তোমার কথায় আমার প্রধান আপত্তি এই যে, তোমার চিন্তার জন্য একমাত্র তোমার নিজের থেকেই তুমি সাহায্য পাবে। বাইরের সব পথ তোমার বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি নিজেকেই জানতে পারবে না, কারণ অন্যের সংস্পর্শে না এলে তুমি নিজেকে জানতে পার না।'

'তা অবশ্য সত্যি'— বলিলাম—'বাহিরের সংস্পর্শে না আসলে নিজের খানিকটা অংশ জানা যায় না। কিন্তু গত দশ বছর ধরে আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, বহু লোকের সঙ্গে মিশেছি। কাজেই আমি মনে করি, সে-অংশ খানিকটা আমি জেনেছি। সেখানে আর এমন বিশেষ কিছুই বোধ হয় নেই যা আমি জানা দরকার বলে মনে করি। বাইরের সংস্পর্শে এলে আমি আর উল্লেখযোগ্য কিছুই জানতে পারব না বলেই আমার বিশ্বাস। অথচ এদিকে, আমার ভেতরে একটা বিরাট বিশ্ব যেন পড়ে আছে ; সম্পূর্ণ অজানা অনাবিষ্কৃত জগৎ ; একটা বিশ্ব যাকে জানতে হলে চাই দ্বিধাহীন ধীর চিন্তা আর চিন্তা। শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যই এটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আরও কতগুলো কারণ আছে যার জন্য একে দেখতেই হবে। আমার বাইরের রহস্যটাকে জানতে হলেও তো আগে চাই নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান?...

কথাগুলো একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে তোমাদের মনে হচ্ছে বোধ হয়, কিন্তু সত্যি সত্যিই এসব কথা আমার মনে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।— যাকগে আর কী বলব! তবে আমার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস কোরো না।'

...কপিলের বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। ও বিদায় লইয়া চলিয়া যায়।

...এখন আমি আর রঞ্জন। সংযত বাক্, চিন্তাশীল রঞ্জন, সমস্ত তর্কের মধ্যে ও প্রায় কথাই বলে নাই। শুধু শুনিয়া গিয়াছে, যাহা বলিয়াছে... ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা শব্দ যেন বাছিয়া বাছিয়া।... ও এখন কী প্রশ্ন করিবে, ভাবিলাম আমি। কোনো প্রশ্নই

ও করিল না, মাথা নিচু করিয়া মন্দগতিতে ও চলিয়াছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, হাত দুইটি আড়াআড়িভাবে বক্ষে রাখিয়া...। আবার বাড়ির মোড়ে আসিয়া ও শুধু আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে ক্ষণেকের জন্য তাকাইল। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেল...

সিদ্ধান্ত

কাল রাত্রে বর্ষা আবার নামিয়াছিল।... ঘন ঘন বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ, গুরু গুরু মেঘের মন্দ্র, সামনের মাঠের তাল গাছটায় জল ঝরার আওয়াজ—বহু বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় শব্দে কাল রাত্রি মুখরা হইয়া উঠিয়াছিল। অশনি ও জীমূতে মিলিয়া রাত্রিকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল।

কাল রাত্রে বর্ষা নামিয়াছিল। অশ্রান্ত ধারাপাতে যত কিছু জগতের ডুবাইয়া, ভাসাইয়া দিয়াছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার কালো নিবিড়— ।... বহু রাত্র পর্যন্ত আমি চিন্তা করিয়াছি। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় আমার চিন্তাস্রোত খুলিয়া গিয়াছিল। বাহিরে প্রকৃতির মহাসংগীত, ঘরে চেয়ারে বসিয়া কপোলে হাত রাখিয়া আমি চিন্তামগ্ন। কখন যে টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, জানি না। ভোরের তরল অন্ধকারে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, তন্দ্রাজড়িত চক্ষে দেখি শেজটা তখনও মৃদু আলোক বিকিরণ করিতেছে।... শেজটি নিভাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই।

বৃষ্টি নাই, ভোর এখনও হয় নাই, সবে অন্ধকার মিলাইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। অনেকদিন পর আজ একটু বাজাইতে ইচ্ছা হইল। সরোদটা হাতে করিয়া ঘরে গিয়া বসি।

...টোড়ির কড়ি মধ্যম কোমল ধৈবত গান্ধারের কুহকময় সম্মিলনে উত্থিত ধ্বনি-তরঙ্গে ঘরটি ভরিয়া যায়। বহুক্ষণ ধরিয়া বাজাইয়া যাই। টোড়ি রাগের সুরঝংকার ভোরের সুরের সঙ্গে আমার মনের সঙ্গে অদ্ভুত খাপ খাইয়াছে, ইহাতে মনে একটা অব্যক্ত রিক্ততার বাণী আনিয়া দেয়... বাজাইয়া যাই।—

সকাল হইয়া আসে ; রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হইয়া যায়। ভোরের ধ্যানমগ্নভাব কাটিয়া সকালের কর্মব্যস্ততা আসিয়া পড়ে। আরও একটা দিন চলিয়া যায়, ভাবিলাম আমি, দিন চলিয়া যাইতেছে, সীমাবদ্ধ জীবনের আরও অমূল্য একটি দিন। মনে পড়ে সেই ফরাসি কবিতার টুকরাটি—

La vie est breve—
    Un peu despoir
Un peu de reve—
    Et pois—Bonjoir.
(জীবন সংক্ষিপ্ত—
    সামান্য আশা
ক্ষণিকের একটি স্বপ্ন—
    তারপর বিদায়)।

কবিতাটি কোন এক বাংলা বইয়ে সেদিন পড়িতেছিলাম। Un peu despoir, অতি ক্ষুদ্র আশা, আমার যাহা এখনকার চরম লক্ষ্য, তাহাতে পৌঁছিব্যর অতি সামান্য আশাই আমি করি। আমার না আছে উপযুক্ত জ্ঞান, না আছে অভিজ্ঞতা। হয়তো আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহা মোটেই সত্য নয়, আমার অজ্ঞানান্ধ মন, বিকৃতভাবে দেখিতেছে সমস্তকে। কী জানি—

...হতাশ হইয়া যাই আমি। তবু যে-পথে যাইতেছি তাহার শেষ দেখিব ; আমার সংকল্প হইতে কেহ আমাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।... জানি হতাশা আসিবে, আসিবে ভীতি— তাহার জন্য আমি প্রস্তুত।

আমি জানি যেমন ইহারা আসিয়া ভিড় করিবে তেমনই যদি ইহাদের কাটাইতে পারি— আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে অপরিমেয় আনন্দ...

কাল বহু রাত্র পর্যন্ত এ-বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করিলাম আমি, পিছনে যখন কোনো বন্ধন নাই, তখন বাবাকে বলিয়া আজই আমি চলিয়া যাইব গ্রামের বাড়িতে।

তাহার পর... ব্যর্থতা না সাফল্য? এখন তিন মাসের জন্য বলিয়া যাইব। পরে দরকার হইলে ওখানেই থাকিয়া যাইব। সঙ্গে লইতেছি অজস্র পুস্তক, খালি পড়িব আর ভাবিব। এই আপাতদৃষ্ট জগৎ, তাহার রহস্য, এই প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য, এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর আমার চাই। সঙ্গে লইব সরোদ, সর্বঋতুর বিভিন্ন রূপগুলি গ্রাম্য আবহাওয়ায় সরোদ কোলে বসিয়া দেখিব— আর কঠিন ইস্পাতের তারে লাগাইব সেই ঋতুর আবাহনের মূর্ছনা।...

ধরিত্রী ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলিবে, প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা ঘটিবে, মহাশূন্যে মহাকালের আবর্তন। কত নীহারিকাপুঞ্জ সৌরজগৎ সৃষ্টির সাধনায় নিজেকে আবদ্ধ করিতে থাকিবে, আর আকাশে জ্বলজ্বল করিবে সপ্তর্ষির মহা প্রশ্নচিহ্ন। আমার গ্রাম্য কুটিরের দাওয়ায় তাহাদের যে-রশ্মি আসিয়া আমার চোখে লাগিবে, কত লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ আগে তাহারা ওই নক্ষত্রগুলি হইতে যাত্রা করিয়াছিল, কত বিরাট পথ অতিক্রান্ত করিয়া তাহাদের যাত্রা শেষ হইবে আমারই ঘরের দাওয়ায়।...

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ, সচকিত হইয়া উঠি। দ্বার খুলিয়া দিই, রঞ্জন আর কপিল প্রবেশ করে।— কহিলাম 'ঠিক করে ফেললাম ভাই, আজই যাব আমি। মন টিকছে না এখানে আমার।' কপিল বলে— 'নাঃ, তুই পাগলই হলি। এ সব বদ্ধোন্মাদ ছেলে নিয়ে তো আর পারা গেল না, এদিকে রঞ্জনটা সেই কাল থেকে যে মুখ গোমড়া করে বসে আছে, আর কথাই বলছে না ভালো করে।'

রঞ্জন হেসে বলে—'পাগল কে না ভাই, তুই নিজেকে মনে করিস প্রকৃতিস্থ বলে, অথচ তুই-ই সময়বিশেষে এমনসব কাজ করে বসিস যা করে হয় পাগলরা অথবা করে বোকারা।

'ও যাকগে'— কপিল অন্য কথার অবতারণা করে,— 'তোর এ কাজটা ভালো লাগছে না আমার। কালও বলছিলাম, আবার বলি, এমনভাবে পালানোটা কাপুরুষের কাজ।'

বলি— 'এ-বিষয়ে আমার বলবার কিছু নেই, জানি তোর মনকে আমার চিন্তার ধারা বোঝাতে পারব না।'

ও বলে— 'আমরা সাধারণ মানুষ, আপাতদৃষ্টিতে যাকে পৃথিবী বলে মনে হয়, তাকেই মেনে নিয়ে আরামে আছি। তাকেই ভালোবেসে, অন্য জগৎটাকে না জেনেও কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না আমার।'

'হয়তো তোর কথাই ঠিক'—বলিয়া চলি, 'কে তার উত্তর দেবে, কেমন করে জানব? তাই একবার দেখতে চাই। তবু হয়তো আবার আমায় ফিরে আসতে হবে তোদের পথে। তবে পৃথিবী সম্বন্ধে একটা কথা বলি। পৃথিবীটাকে আমি তোদের মতোই ভালোবাসি— তুই কোথাও একটা ভালো গান শুনলে বলিস 'বেশ গাইল', হয়তো তোর সন্দেশ খেতে ভালো লাগে—যদিও জানিস এসবগুলোই ক্ষণস্থায়ী, এক্ষুনি এরা শেষ হয়ে যাবে, তবু তুই ভালোবাসিস। ভালো একটা বই তোকে আনন্দ দেয়, যদিও তুই তার একবর্ণও বিশ্বাস করিস না। আমিও এ-পৃথিবী ভালোবাসি, তার সংগীত আমার ভালো লাগে বলে, প্রকৃতির আস্বাদ অপূর্ব বলে। হোক না এরা ক্ষণস্থায়ী? আমি নিজে কী?'

কপিল মাথা নাড়িতে থাকে। আমার কথা সে গ্রহণ করিতেও পারিতেছে না, অথচ মনোমতো কোনো যুক্তিও খুঁজিয়া পাইতেছে না।—

আমার ভালো লাগে না আর এসব কথার কচকচি— এদের বলিয়া ভুল করিয়াছি আমি, নিঃশব্দে চলিয়া যাইলেই ভালো হইত। শুধু শুধুই দেরি হইয়া যায়।

কপিল কোনো কথা বলে না। বহুক্ষণ কাটিয়া যায়, চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ... কপিলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি। তাহাকে এমন গম্ভীর, চিন্তাশীল মনে হইতেছে! আর রঞ্জন, প্রিয়দর্শন মননশীল রঞ্জন, মুখের কোণে এক টুকরা হাসি, অথচ বিষাদগম্ভীর ভাব, বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে।—হঠাৎ কপিল মন হইতে যেন এই গাম্ভীর্যটা ঝাড়িয়া চটুলকণ্ঠে বলে, 'শেষ পর্যন্ত তা হলে গেলিই তুই। তবে তো তোর জন্য একটা বিদায় সভার আয়োজন করতে হয়, আমার কথা অবশ্য ভাবিস না, আমরা যোগী তপস্বী নই'— তার পর নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া বলে—

'মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম ; রয়েছে বিশ্বলোক...
হে বন্ধু বিদায় ॥'

চেষ্টা সত্ত্বেও ওর কণ্ঠে করুণ সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে। আমি উহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি।

ও আর কথা বলিতে পারিতেছে না। ঘরের মধ্যে সকরুণ একটা নিস্পন্দতা। কেমন মনে হয় ইহারাও আমার অনেকখানি, ইহারা না থাকিলে কোথায় যেন একটা ফাঁক থাকিয়া যায়... ভাবিয়াছিলাম পিছনে আমার বন্ধন নাই, এখন দেখি প্রতি পদেই আমার বাধা।

এই বাড়িটা, যাহার কথা আমি ভুলিয়াও মনে করি না, ওই ছোট্ট বাগানটি, যাহাকে এতদিন জল দিয়া আসিতেছি, আমার ঘরের দেওয়ালে বাঁকা হইয়া ঝোলা পুরাতন দিনপঞ্জিটি, আমার চারিপার্শ্বের তুচ্ছ বৃহৎ সবকিছু আমার যাইবার সময় মুখর হইয়া উঠিয়াছে।... আমার সাধনা বুঝি এইখান হইতে আরম্ভ হইল, ভাবিলাম আমি। এইসব বন্ধন, ইহাদের কাটাইতে হইবে, কাটাইতে হইবে ইহারা মিলিয়া আর সব মিলিয়া যে এক, তাহাকে পাইবার জন্য, কাটাইতে হইবে অমৃতের সন্ধানের জন্য। যদি আমি সেই সবার বড়ো এক-কে পাই, তবে আমি স্থানকালকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিব, মৃত্যু জয় করিতে পারিব, সেই তো আমার অমৃত—

কপিলরা ওঠে। ইহাদের আগাইতে ফটক পর্যন্ত যাই। উহারা রাস্তায় নামিয়া আমার দিকে তাকায়। বলি—'৭টায় ট্রেন, আমাকে উঠিয়ে দিতে আসিস কিন্তু।' রঞ্জন ঘাড় নাড়ে, কপিল শুধু তাকাইয়া থাকে। ফটক বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলাম।...

স্টেশনের বেঞ্চে বসিয়া আছি। চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র কলরব, যাত্রীর ভিড়, টিকিটঘরের সামনে মারামারি। কপিলরা এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। পাশে একটি ছোটো সুটকেস, আশেপাশে কর্মব্যস্ততা, চুপ করিয়া বেঞ্চে বসিয়া আছি।—

একটা কুলি সামনে দিয়া মাথায় করিয়া মোট লইয়া যায়, প্ল্যাটফর্মের উপর হইতে কে যেন সঙ্গীকে ডাকিতেছে। এক ভদ্রলোক হাতে টিকিট লইয়া পয়সা গুনিতে গুনিতে টিকিটঘরের ভিড় হইতে বিজয়গর্বে বাহির হইয়া আসেন। এধারে বোধ হয় তাঁহারই পরিবার, একটি ঘোমটা ঢাকা কলাবউ, একটি ছোটো ছেলে, একরাশি মালপত্র। ছেলেটি কাঁদিয়া উঠে, বধূটি অস্ফুটস্বরে তাহাকে কী যেন বলিতেছে ; ভদ্রলোক আসিয়া রং-চটা টিনের ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া কোঁচা দিয়া হাওয়া খাইতে আরম্ভ করেন। দুর্বোধ্য চিৎকার, গাড়িঘোড়া, লোকের আওয়াজে স্থানটি ভরিয়া আছে ; আমি অলসনেত্রে দেখিয়া যাই।...

রেললাইনের ওপাশে একটা ফুটবল খেলার মাঠ, বাঁশের গোলপোস্টগুলি দাঁড়াইয়া আছে। একটার 'ক্রসবার' ভাঙা।... তাহারও ওধারে বাবলার জঙ্গল, একটা বট গাছ অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিরাট গাম্ভীর্য সহকারে স্তব্ধ হইয়া আছে, দেহে তাহার বয়সের বলিরেখা, তাহার তলায় অজস্র পর্ণে স্থানটি ভরিয়া আছে... 'গোধূলির আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসে।' বন্ধুরা এখনও আসিল না কেন? ট্রেনের সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে।—

আমার পার্শ্বে দুইটি গ্রাম্য লোক টিকিটের পয়সা লইয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে। অসহ্য কোলাহল, কৌতূহলীর ভিড়, বিরক্তভাবে উঠিয়া যাই। প্ল্যাটফর্মে ঘুরিতে থাকি। প্রত্যেকটি স্থান এক-একদল যাত্রী দখল করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ সীমায় স্টেশনের নামে ফলকটির উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াই। ঝিরঝির করিয়া একটা মৃদু বাতাস বহিতেছে। জঙ্গলের কোথায় যেন একটি নাম-না-জানা পাখি শিস দিতেছে, ভারি মিষ্ট লাগে। মনে পড়ে কীট্সের উক্তি—The poetry of earth is never dead!... মনে হয় এই তো নিকটেই এত বড়ো শহর, কত কর্ম-কোলাহল, আর তাহার এত কাছে বিরাট বনানী মৌন ধ্যানস্তিমিতভাবে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে।

ওই যে বট গাছটি, উহা, আমি যখন এখানে প্রথম আসি, যখন স্কুলে ভরতি হই, যখন আমার জন্ম হয় তখনও এই পারিপার্শ্বিকতায় এইভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল। এমনকী, যখন আমার পিতার জন্ম হয়, তখনও বোধ হয় এমনিভাবেই উহার প্রত্যেকটি কোষ নূতন কোষের জন্ম দিয়াছে ; এমনই ক্লোরোফিলগুলি জীবনীরস সংহত করিয়াছে।—

মাথায় চিন্তা আসিতেছে। এ উহার ঘাড়ে পড়িয়া, একটার সহিত অপরটার কোনো যোগ নাই, অসংলগ্ন... যেন ছায়াছবিরা পর্দার উপর দিয়া দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে।...

কিন্তু বেশ লাগে এই মৃদু বাতাসটি... হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলাম। কে যেন পৃষ্ঠে হাত রাখিল। পিছন ফিরিয়া দেখি, রঞ্জন ও কপিল। রঞ্জন উৎফুল্ল, মুখে খুশির আমেজ, কপিল চিন্তামগ্ন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছে।

কেহ কোনোই কথা কহিলাম না। দরকারও ছিল না। ঠিক এই সময়টাতে সব চাইতে বেমানান লাগিবে কথা। আমি শুধু একটু মৃদু হাসিলাম।

সে-চিত্রটি আমি জীবনে ভুলিব না। কপিল দূরে বনপ্রান্তের দিকে আছে তাকাইয়া।...রঞ্জন আমার পৃষ্ঠে যেমন হাতটি রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই পূর্ণদৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া আছে, চিত্রার্পিত, মুখের কোণে খেলা করিতেছে স্বল্প হাসির সংকেত। চোখ দুটি উহার কী উজ্জ্বল, ভাবিলাম আমি।...

ট্রেনের আওয়াজে চমক ভাঙিল। আসিয়া গিয়াছে ট্রেন। চিৎকার, হট্টগোল, মাঝে একটু কমিয়াছিল, আবার বাড়িয়া উঠিল। সুটকেসটি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে একটি কামরায় গিয়া উঠি। উহারা আসে আমার সঙ্গে।

ঘর অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। উহারা আসিয়া দাঁড়ায় আমার জানালার কাছে। কপিল অন্যদিকে তাকাইয়াছিল। চকিতে আমার দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকায় ; তাহার পরই দৃষ্টি নত করে। রঞ্জন হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে— 'প্রতীক্ষা করিস, আমি যাব তোর কাছে!'

উত্তর করি না। ঘাড় নাড়ি কেবল। ও অস্ফুটস্বরে আবার বলে 'যাব, যাবই আমি।'

আচম্বিতে ও ঘুরিয়া রওনা দেয়। কপিল ঘুরিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। কী অদ্ভুত চাহনি উহার, ঠোঁট দুটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে বারেকের জন্য। মুখে একটা মিনতির ভাব।

আমি ভাঙিয়া পড়িতেছি নাকি? গলা দিয়া কী ঠেলিয়া উঠিতেছে? দমন করিতেই হইবে, মন দৃঢ় করিবই, করিবই আমি। উঃ ভগবান...

রঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া সুদৃঢ়হস্তে কপিলকে ধরিয়া লইয়া যায়। উহারা যাইতেছে— রঞ্জন দৃঢ় পদক্ষেপে... কপিল ঘাড় গুঁজিয়া।—

উহাদের পায়ের তলায় প্ল্যাটফর্মের কাঁকরগুলি হইতে একটা অদ্ভুত আওয়াজ নির্গত হইতেছে... উহারা স্টেশন হইতে বাহির হইল... রাস্তায় নামিল।...ভাঙা দেউলের পাশ দিয়া রাস্তা বাঁকিয়া চলিয়া গেছে।... আমার জানালা হইতে শ্যামায়মান রাস্তায় দেখা গেল উহাদের বাঁক পর্যন্ত। বাঁক ঘুরিয়া চলিয়া যাইবার সময় কপিল কি আমার দিকে ফিরিল?...

একটা বিষাদের ভাব আমার মনে চাপিয়া আসে। দূর দিগন্তের ছায়ায় উহাদের সঙ্গে আমি অনুভব করি, আমার সমগ্র পুরাতন, অন্তরঙ্গ জীবনটাকে ফেলিয়া গেলাম পিছনে। একটা নূতন, আশ্চর্য জগতে এখন হঁইতে থাকিব আমি। এই বিচ্ছেদের ফলে কী আসিবে?

কিংবা বোধ হয়, ভাবি আমি, কিছুই আসিবে না ইহা হইতে। বোধ হয় অত্যন্ত মূর্খতা করিয়াছি আমি।

কামরাটি এখন প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার। আকাশে মেঘদল ঝুঁকিয়া আছে। একদিকে একটা বিদ্যুৎ চমকায়। শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে ; দূরের দিক্‌চক্রবালের কলঙ্করেখা ঝাপসা হইয়া উঠিল। বৃষ্টি আসিতেছে, তৃষিত ধরিত্রীর প্রার্থনার ধন!

বোধহয় বোকামো করিয়াছি, ভাবি, কিন্তু আকাশের বিদ্যুতের দিকে তাকাইয়া খানিকটা যেন আশ্বাস পাই...

অভিধারা ১ম বর্ষ মহালয়া ৩য় সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৪ পৃষ্ঠা ৪০-৫৩

আকাশগঙ্গার স্রোত ধরে

একবার একটা ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল সেই দেশে, যেখানে যাবার জন্য তোমার আমার আর চেষ্টার অন্ত নেই। তোমার মনে মাঝে মাঝে ভেসে আসে সে-দেশের স্বাদ। ছেলেটির মুখ থেকেই শুনেছি, গল্পটা বলি শোনো।

সে-জায়গাটায় যেতে হলে নাকি ট্রেনে চাপতে হয়, তার পর মোটরে, তারও পরে পায়দলে। পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা সে-দেশ। বিরাট রাস্তা অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছোতে পারলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে একটা আরাম-ভরা বিছানা। বিছানা ঘিরে আরও আসবাব ঘিরে ঘর, ঘর আর বারান্দা নিয়ে বাংলো। ছাদ তার লাল রানিগঞ্জ টাইলের, সবুজ তার জানালা দরজা, ঢেউয়ের ফেনার মতো বিমলিন শ্বেত তার দেওয়াল আর বাংলোর সামনে মেহেদির বেড়া দেওয়া ছোট্ট বাগান। বাগানের সামনে উঁচু-নিচু কাঁকরের লাল রাস্তা চলে গেছে গঞ্জের দিকে—

জানালার সামনে এসে যদি তুমি দাঁড়াও, দেখবে বাংলোর পেছনে ঘোরাই-এর মতো এবড়োখেবড়ো জমি, তারপর পাহাড়ি হেস্তো নদীর গভীর বিছানা। তারও পর থেকে নীলচে ধূসর পাহাড়ের সারি নীল আকাশের পথ ধরে উধাও হয়ে গেছে। ছেলেটি যখন গিয়েছিল, তখন সেটা ছিল গ্রীষ্মের শেষ, মেঘেরা তখনও তপ্ত-তাম্র আকাশে দেখা দেয়নি, আর জলের অভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে পাহাড়ি হেস্তো নদী জীমূতের দেখা পাওয়ার সাধনায় তপোরতা পার্বতী হয়ে উঠেছিল। জায়গাটা রামগিরি থেকে বেশি দূরে নয় ; সময়টাকে ধাক্কা দিয়ে হাজার দুয়েক বছর পিছিয়ে নিতে পারলে ছেলেটা অনায়াসেই স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষের ভূমিকা নিতে পারত।—

তিন দিন ধরে যাত্রার ধকল সহ্য করে ছেলেটি পৌঁছোল তার সেই বাংলোয়। তখন রাত। চাঁদ তখন সামনের টিলাটার মাথায় উঠি উঠি করছে। কাছাকাছি লোকালয় আছে বলে তার মনে হল না। গাঢ় আঁধারে চরাচর পরিব্যাপ্ত।— পাহাড়িয়া জঙ্গলের গাছে বসে কোনো এক চন্দ্র-দগ্ধ পক্ষী গলা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে স্বর্গীয় সংগীতের স্রোত।— শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি ওঠে জমাট-বাঁধা আঁধারের স্তূপ থেকে, কোনো সম্বর হরিণ চলে গেল বুঝি, দূর থেকে ভেসে আসে চিতাবাঘের ঘড়র ঘড়র ডাক। সমস্ত বনভূমি সারাদিন নিশ্চুপ খোলাপাতার মতো পড়েছিল, তখন ধীরে ধীরে বাণীময় হয়ে ওঠে। প্রাণের স্পন্দনে চঞ্চল অরণ্যানী। একটা রহস্য-ভরা অব্যক্ত বাণী তার মনে এনে দেয়। ওর বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে, যেন আদিম পৃথিবীর মাতৃ-আহ্বান ও শুনতে পাচ্ছে।

অরণ্যের একটা আত্মা আছে। তার ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়, তার রাত্রির শাখাময় জটাজালে, তার খর মধ্যাহ্নের জ্বালাময় দীপ্তির মধ্যে, তার অজস্র পর্ণ-ঢাকা বৃক্ষছায়ে, তার প্রতিটি অরণ্য পুষ্পের মধ্যে সে প্রাণশক্তি প্রবাহিত। তারা ভেতরে ভেতরে প্রাণের আবেগে স্পন্দমান। আজ যখন ওর যাত্রা হল শেষ, অলসভাবে বেতের চেয়ারে বসে

বারান্দায় ও এই শান্তির মহা ব্যাখ্যার দিকে তাকাল। আশপাশের বিচিত্র আবহাওয়ার ভেতর থেকে, ওর মনে এসে খুব আস্তে লাগল প্রকৃতির চুপিচুপি করে বলা কথাগুলো। ও যেন মগ্ন হয়ে যায়, লীন হয়ে যায় এই স্পন্দিত ধরিত্রীর মধ্যে।

আকাশের দিকে তার দৃষ্টি গেল। নিশীথরাজ সোমদেব তাঁর রৌপ্যরথে চলেছেন উদীচী পর্বতের দিকে মণ্ডলাবৃত হয়ে। টুকরো টুকরো মেঘের আভাস এখানে-ওখানে, তাদের বুকে চাঁদের রশ্মিজালে ইন্দ্রধনুর মতো মোহ তৈরি করে। তির্যক আলো এসে পড়ছে তার উঠোনে। মেহেদি বেড়ার আলো-আঁধারের মধ্যে গোঁড় চাকরেরা বসে খুব সম্ভব দেশের কথাই বলাবলি করছিল মৃদুস্বরে, মাঝে-রাখা লণ্ঠনটির আলো এসে পড়েছিল তাদের সেই চোয়াল-উঁচু কালো মুখে আর ছোট ছোট চোখগুলোতে, পড়ে চকচক করছিল ; ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। স্বদেশের কথা বললে আজও ছেলেটির সেই প্রথম রাতের ছবিটা মনে পড়ে যায়।—

ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু সে চেয়ারে বসে ভাবতে শুরু করল। তার মাথায় ভাবনা ঢুকে গেছিল। নানা দেশ সে দেখেছে ; পাহাড় আর জঙ্গল, শহর আর গাঁ, সমুদ্র আর ধানখেত, সব। কিন্তু এই প্রথম তার এ বিচিত্র অনুভূতি। যেন এই চরিত্রহীন প্রাণীর রাজ্য হওয়াটাই বড়ো কথা, আর কিছু নয় ; সমস্ত আবেষ্টনীর রুক্ষ প্রকৃতি যেন তাই বলছে। আমি আছি, এই কথাটা ওর মনে হঠাৎ কেমন পরম কথা বলে প্রতিভাত হল আজ এই আঁধার রাতে। অদ্ভুত, যেন পথ আর পথের উপান্ত এক হয়ে যাওয়া! দর্শনশাস্ত্র নয়, এ তার প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে অনুভব করা কথা, এ আমি আদালতে তামা-তুলসী হাতে করে বলতে পারি, কারণ ছেলেটি এতই বোকা, যে এসব কথা বানানোর মতো বুদ্ধিও তার জোগাবে না।

পরের দিন সকালে, সে দাঁড়িয়েছিল একটা স্টেশনের বাইরেতে। গতরাত্রে ছেলেটি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। জ্বলন্ত সূর্যটা যখন তাকে ছোঁয়া দিয়ে অভিবাদন করল, তখন তার ঘুম ভাঙল। উঠে বসেছিল ও। আজ তার যাবার কথা মাইল কুড়ি দূরে ট্রাকে। একটা উৎসব আছে সেখানে। আমাদের নায়ক এসব বিষয়ে খুব উৎসাহী, একগাদা লোকের সঙ্গে ঝাঁকুনি খেতে খেতে সে এসে পৌঁছোল এই পাহাড়ি স্টেশনের সামনেতে। আর একদল যাত্রী আসবে ট্রেনে, তাদের নিয়ে যাবে গন্তব্য স্থানে।

বেশ লাগছে ওর বাতাসটি। শান্ত, নিস্তব্ধ পরিবেশ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ শব্দটুকুও শোনা যায় যেন। ও হাঁটছে কাঁকর-বিছানো রাস্তায়, একটা বিচিত্র আওয়াজ নির্গত হচ্ছে। এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ও, পা দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে কান পেতে শুনল আওয়াজটা। দূরে উর্দুতে কাদের কথা-কাটাকাটি ভেসে আসছে, পিঙ্গল পাহাড়ের গায়ে শলাইয়া গাছে বসে একটা পাখি অনবরত ডেকে চলেছে, আর ঝিরঝির করে বইছে নির্মল, পবিত্র বাতাস। বেশ লাগছে।

ট্রেন এসে পড়ল। ছোটো স্টেশনটি ঘিরে নেমে এল ক্ষণিকের মুখরতা। ও কান পেতে শোনে খানিক, তারপর আস্তে আস্তে ট্রাকের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাছে একটা পাহাড়ের গায়ে একটা পলাশ গাছ। আশেপাশে সব রুক্ষ, শুধু গাছটি অজস্র ফুলে ফুলে আছে ভরে। এত সুন্দর দেখতে লাল ফুলের দল!

ওদের দলের যিনি নেতা, তিনি ফিরে এসে ওর কাঁধে হাত রাখেন। ও ঘোরে—

সেই প্রথম ও দেখল তাঁকে। কোজাগরী পূর্ণিমার মতো তাঁর রূপ, এই একটি কথাই আমি বের করতে পেরেছি তার কাছ থেকে। এ উপমা তার কেন মনে হয়েছিল জানি না, ভাষায় তার দখল নেই। ওর মতে কিন্তু এই একটি কথাতেই সে মেয়েটির সমগ্র রূপটা ধরা পড়ে।

প্রেমকাহিনী এটা নয়। অন্তত সাধারণ প্রেম নয়। ভদ্রমহিলাটি বিবাহিতা এবং আমাদের নায়কের চাইতে বছর আষ্টেকের বড়! তাঁর তিনটি পুত্রকন্যাও তাঁর সঙ্গে এসেছে।

আমাদের নায়কের মনে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হতে থাকল সত্যি। কিন্তু ছেলেটি প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বিচার করে দেখল ভাবটা একটু অদ্ভুত ধরনের। প্রথম দর্শনে প্রেম অবশ্য একে বলা যেতে পারে, কিন্তু সে-প্রেমের সংজ্ঞা প্রচলিত মান অনুসারে হবে না। কারণ ছেলেটির ওকে দেখেই মনে পড়েছিল তার বিস্মৃত শৈশবে ফেলে আসা মায়ের কথা!

এক-একটা মেয়ে থাকে, যারা মাতৃভাব ছড়াতে চায়। ভুলে-যাওয়া মায়ের কথা, আর সেইসঙ্গে আরও একটা কী ব্যাকুলতা তাকে ছেয়ে ফেলল।

বুঝলে, এই তো গেল তাদের প্রথম আলাপ। তারপর সেই যেখানে উৎসব হবে, সেখানে গিয়ে আর বহু ছেলে-বুড়োর সঙ্গে তারা এক বাড়িতেই উঠল। সেটা ছিল একটা বিরাট বাড়ি।

ছেলেটির কয়েকটি বদ্ধ ধারণা ছিল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, ছোটো ছেলেদের সঙ্গে যে একেবারে মিশে যেতে না পারে, সে-লোক সুবিধার নয়। এবং আর একটা হচ্ছে, খাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা করাটা শুধু বোকামো নয়, রীতিমতো অপরাধ। সেই মতবাদ ধরে গাড়ি থেকে নামার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই সে ক্ষুদে ফৌজের সঙ্গে সারা বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল। তারপর খেতে বসে সে মরি-বাঁচিভাবে খেয়ে বসল অন্যের দ্বিগুণ। ভদ্রমহিলা করছিলেন পরিবেশন। এটুকু বোঝা গেল, তাঁর মতবাদ ছেলেটির থেকে খুব পৃথক নয়। পার্থক্য যেখানে, তা ছেলেটির পক্ষে সুবিধাজনকই। অর্থাৎ খাওয়াতেই তিনি ভালোবাসেন। ছেলেটির হৃদয় উজাড় হয়ে গেল।

তার পর যে কয়দিন তারা ছিল সেই জায়গায়, তার মধ্যে গাড়ি করে নানা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা, কোথায় কোন এক প্রপাত দেখতে যাওয়া, নাচ-গান-হল্লা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আমাদের নায়কের মনোভাব আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে এল। ভদ্রমহিলাও তার এ মনোভাব ধরতে পেরেছিলেন, ধীরে ধীরে তিনিও তাকে বিচিত্র স্নেহজালে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। সেই জংলা পাহাড়ের মধ্যে, আকাশ যখন গাঢ় নীল, সামনে ঝরনার উপলব্যথিত গতিকে রেখে, ময়ূরে-চিতাবাঘে অধ্যুষিত বহু প্রাচীন সেই বিশাল অরণ্যানীর অভ্যন্তরে এই দুটি হৃদয় সেই শেষ জ্যৈষ্ঠের খরদ্বিপ্রহরগুলোর মধ্যে পরস্পরকে গ্রহণ করেছিল। চারিপাশের তাদের প্রতি উদাসীন পৃথিবী তাদের কাছে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল, মহাব্যাপ্তি ও মহাকালের অতি ক্ষুদ্রতম অংশে নিখিল জীবনস্রোতের এই দুটি ঢেউ মিশে গেল। সুচিরকালের মানবমনের মহা-অভিযানে তারাও বেরিয়েছিল, *the*

two lost souls strode hand in hand, shoulder to shoulder, amidst the wilderness of this indifferent universe, in quest of Blue-bird!

মেয়েটির পৃথিবীতে থাকার মধ্যে এক বোন, কোথায় শ্বশুরঘর করছে। প্রতি ভাইফোঁটার দিনে তার মনের মধ্যে যে-মোচড় উঠত, তারই নিরুদ্ধ প্রীতি স্রোতধারাস্রাবে অভিষিক্ত করেছিল এই শ্যামলা ছেলেটিকে সেই দিন। ছেলেটির মাঝে মাঝে মনে আবছা-জাগা একটা মোটা সিঁদুরের টিপ-পরা মুখ যে ভাসত, সে যেন এই উজ্জ্বল গৌরীর মুখের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। একটা বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে, মা-ছেলের সঙ্গে ভাই-বোনে মিলিয়ে— ।

আর কিছুদিন বাদে। মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটি গিয়েছিল তাদের বসতিতে কাছেই। সেখানে তার আলাপ হয়েছিল বহুলোকের সাথেই। তার হাসিতে গানে কৌতুকে স্নেহে উচ্ছল চরিত্র আকর্ষণ করেছিল বহু ব্যক্তিকেই। তার সে দেশে স্পট-লাইট ফেলে ফেলে হিলম্যান-স্মিংক্সে চড়ে উইনচেস্টার মারফি কাঁধে করে রাতের বেলায় বেড়ানোর ইতিহাসও অনেক। তার সে-জীবনযাত্রা আমার এ কাহিনীতে স্থান পাবে না।

শুধু একটি। ভদ্রমহিলা গলানো চকোলেট করে একদিন বরফকলে রেখেছিলেন জমাবার জন্য। রাত তখন আটটা। আমাদের নায়কটি ঢুকেছিল আঁধারে লোভ সামলাতে না পেরে। নির্বিঘ্নে হাত দিয়ে তুলে চেটেচেটেই খানিকটা খেয়ে ডালা বন্ধ করার সময় একটা গেলাস ফেলে দিয়েছিল ঝনাৎ করে। বাড়ির ঝি-র গলা শুনে বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই মসীবৎ অন্ধকারে সভয়ে বিস্ফারিত চোখে সে আবিষ্কার করে বসল, দরজাটা পাচ্ছে না খুঁজে। তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলের তলায় চালান যাবার চেষ্টা করে মাথায় একটা নৈনীতাল আলু আমদানি করে ফেলেছিল।

যাই হোক, ঢুকতে সময়মতো সে পেরেছিল। ঝি এসে আলো জ্বেলে একটা বেড়াল দেখে সেটাকে তাড়িয়ে চলে যায়। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে এতক্ষণ বরফজলের স্রোত নামছিল, অনুভূতিই সব ধরলে ওর মাথার চেহারা নিশ্চয়ই কদম ফুলের মতো হয়েছিল। ঝিয়ের কালো কালো পা দুটো চৌকাঠ পেরোলে ও আলো-জ্বালা ঘরে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে চেয়ারে একা একা বসে যতদূর সম্ভব কবি কবি মুখ করার চেষ্টা করেছিল। খানিকবাদে বুকের হাপরের মতো ওঠানামা কথঞ্চিৎ কমলে ও নিশ্চিন্ত হল এই বলে যে এ অভিযানের দায়িত্বভার বেড়ালের ওপরেই ন্যস্ত হবে নিরাপদভাবে।

এমনসময় খাওয়ার ডাক পড়ল। ও সেই সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বারের জন্য খাওয়ার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে বাড়ির অন্যান্য সভ্যরা টেবিল ঘিরে বসে আর ভদ্রমহিলাটি বরফকল খুলে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। ও খুব স্বাভাবিক হয়ে বসে আবহাওয়া সম্বন্ধে মামুলি মন্তব্য প্রকাশ করে। এর মধ্যে ও দেখে মহিলা ওর দিকেই চেয়ে আছেন এবং বিস্ফারিত চোখেই চেয়ে আছেন। ও অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

ব্যাপার বোঝবার আগেই তিনি এসে তার পাশে দাঁড়ান। অন্য সভ্যদের অনুসরণ করে তার দৃষ্টি গেল নিজের শার্টের সামনের দিকে— খয়েরি রঙের ফোঁটারা সারা শার্টময় নিজেদের কাহিনী বলছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে!

— ওর হয়ে গিয়েছিল। বেঁচে আছে কী সজ্ঞানে সমাহিত হয়েছে ঠিক ঠাহর করে

উঠতে পারছিল না। বেশিক্ষণ কিন্তু এভাবে গেল না। ভদ্রমহিলা সজোরে ওর চুল মুঠিয়ে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ওর সমাধি আপাতত শেষ হল।

তারপর বাড়িময় তুমুল হাসির রোল! ভদ্রমহিলা অত্যন্ত আদর করে অতীব যত্নসহকারে সবটা চকোলেট ওকে গেলালেন।

...সেদিন রাতে বাইরে শুয়ে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মধ্যরাত্রে। আকাশে পূর্ণচাঁদ উঠেছিল, নীচে উপত্যকায় কালো কালো ছায়ার মধ্যে থেকে স্টেশন-ইয়ার্ডের ওয়াগন-সান্টিঙের শব্দ কানে আসছিল তার। হাওয়া বইছিল জোর, তার মশারির চালটা ফুলে ফুলে উঠছিল। ওর কেমন মনে হচ্ছিল ও যেন ধরিত্রী ছেড়ে উঠে চলেছে মহাশূন্যে মেঘের মধ্য দিয়ে...কেমন যেন একটা ভাব, পঙ্কিলতা, আবিলতার ঊর্ধ্বে গিয়ে সে চলেছে যেন রামধনুকের ছায়ার ওপারে, কী একটা বিশাল শান্তি আর অনন্ত ব্যাপ্তির কাছাকাছি...চারিপাশে তার তারারা জ্বলজ্বল করছে...মহাব্যোমরশ্মিদের খেলা চলেছে...যেখানে সবহারা ফিরে পায় তার সবকিছু,...দাতার অশ্রুলিপ্ত দান সেখানে তার মূল্য ফিরে পায়, যেখানে প্রেমের সাফল্য আর জীবনের চরিতার্থতা অপেক্ষায় আছে বরণমালা হাতে নিয়ে, সেখানে গিয়ে সব স্তব্ধ গানেরা আর লুপ্ত তারারা জমা হল, দীপান্বিতার যেখানে শেষ নেই...অকারণ পুলকে তার মন ভরে উঠেছিল। আবার কথাটা তার মনে হয়েছিল, হওয়াটাই আসল কথা, করা নয়।

তারপর কয়েকটা দিন তার চলে গেছে কোথা দিয়ে। এর মধ্যে কত ছোটোবড়ো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, আমাকেও সব সে বলতে পারেনি, বলতে গিয়ে থমকে কোলে হাত রেখে বসেছিল চুপ করে— ।

এমনসময় একদিন যখন সে দুপুরে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়েছিল মায়ের বুকের ছাতির মতো ঠাণ্ডা মেঝেতে, আশেপাশে তার খুদে ফৌজের দল, কেউ ঘুমিয়ে, কেউ বা ফন্দি আঁটছে মটকা মেরে পড়ে, মাথার কাছে তিনি মৃদুস্তিমিতস্বরে একটা বই পড়ছেন পা ছড়িয়ে বসে, লালপেড়ে শাড়ি পরে চুল এলিয়ে দিয়ে। বাইরে 'লু'র শোঁ-শোঁ ডাক, নীচের ইয়ার্ড থেকে ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে ঠনঠন শব্দ,— হঠাৎ গর্জন করে উঠল মেঘ!

বর্ষের প্রথম বর্ষার সন্নিপাত মেঘাঃ! দরজা খুলে ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। সজল ঠান্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছিল। নয়নাভিরাম কাজলরঙা মেঘ ঝুঁকে আছে ঈশান দিক ভালে। আনন্দের ঢেউ লেগেছিল তার মনে, কলাপীর মতো পাখা মেলে বের করে দিতে ইচ্ছা করেছিল তার। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, হাওয়ায় উড়ছিল তাঁর চুল, একটা কুহকময় গন্ধ তার নাকে এসে লাগছিল...।

বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঝরনাদের নাচ হয়ে গেল শুরু। ঢল নামল তাদের যৌবনোচ্ছল বুকের রাস্তা ধরে। ঢল নামল তাদের নিয়ে নীচে নামার জন্য। সেইসঙ্গে আমাদের নায়কেরও হল সময় নীচে নামার। তার ছুটি ফুরিয়েছে। আবার তাকে তার কর্মময় জীবনে ফিরে যেতে হবে। পথ করে নিতে হবে চিরে চিরে। *Oh-wearied, he is wearied to death!*

— ও ফিরে এল। ওর তখন মনে হয়েছিল একটা কথা। সেটাই আজ আমি লিপিবদ্ধ

করে রেখে যাব। আমাকে ও বলেছিল : তোমরা বল, অতীত যা, চলে গেছে। যা কিছু আর ফিরবে না। আমি বলি, তা সত্যি হতে পারে, কিন্তু অতীতই মূর্ত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, বর্তমান অতীত-ভবিষ্যের মিলনে শূন্যেরই নামান্তর। কিন্তু অতীত স্থির, অচঞ্চল ধ্রুব। তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না। *We know nothing of the tomorrow, but, time is our!* আমার স্মৃতিতে যা রইল তা চিরন্তন। তার একটা স্থির রূপ আছে, তা নির্দিষ্ট, আর তার রূপ আমরা পরিষ্কার ধরতে পারি। মানুষের যা কিছু নিজস্ব, সে তো অতীত...

— এখানেই এ গল্পের ছেদ পড়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের নায়ক ছেলেটি বোকা, আগেই বলেছি। তাই সে যখন শুনল তিনি এসেছেন এই দেশে, এই সমতটে, ও দৌড়ে গেল। কিন্তু আশাহত হতে হল তাকে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে। মহিলা হেসে তার কুশলবার্তা নিলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন, এটা ওটা খাওয়ালেন। কিন্তু ও যাঁকে পেয়েছিল সে অপরূপ দিন কটিতে, তিনি কোথায় ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে গেছেন!

ও গর্দভ জানে না, যে— দেবদেশে ও গিয়েছিল, এ হচ্ছে সে দেশের জিনিস। এখানে পাবে, এতই সুলভ?

গল্পভারতী ষোড়শ গ্রন্থ ১৩৫৪ পৃষ্ঠা ৭৪-৮৪

এজাহার

হ্যাঁ, আমিই করেছি এ কাজ। আমি ভবেশরঞ্জন বাগচী, পিতা গোপেশরঞ্জন বাগচী, নিবাস রামপুর বোয়ালিয়া ; সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে ; এবং সমস্ত ফলাফল বুঝে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। নিজের থেকেই বলছি আমি ; কারো চাপে পড়ে নয়, আমিই দোষী। আচ্ছা, দারোগাবাবু, ভালো করিনি আমি?— ও ছাড়া যে উপায় ছিল না।

জয়া ভয় পেত। মরতে ওর ভয় ছিল।

তাই আমায় এ পথ বেছে নিতে হল।

আচ্ছা, তুমি বল। আমার কষ্ট হবে না?

একসঙ্গে দুজনে মানুষ হয়েছি, ও মোটে বছর দুই-এর ছোটো আমার থেকে। ছোটোকাল থেকে ওকে দেখে আসছি, বড়ো ভালোবাসতাম জয়াকে। ওর দুঃখ দেখলে কষ্ট আমার হবেই।

দুঃখ কীসের?— বাঙালি মেয়ের দুঃখের কারণ কী হতে পারে মনে কর?— স্বামী।

জয়ার বিয়ে দিতে কিছু দেরি হয়েছিল। বয়স আঠারো পার হয়ে যাবার পর ওর বিয়ে হয়। রূপ ওর ছিল, তাই অর্থবান পাত্র জুটে যায়। পাত্রের বয়স কিছু বেশি, চল্লিশের ওপরে। তা ছাড়া দোজবরে। পয়সার অভাবে এ-পাত্রই সকলের কাছে ভগবানের দান বলে মনে হয়েছিল।

শুধু আমি মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসে একথা শুনে আপত্তি করি। সে আপত্তিতে কোন ফল হয়নি। রাগটা আমার চিরকালই বেশি। একটু রাগলে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। সোজা বাড়ি থেকে বের হয়ে পশ্চিমে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

কয়দিন আগে মার পত্র পেলাম বাবার অসুখটা বেড়েছে। অসুখ বরাবরই ছিল, গ্রীষ্মকালে বাড়ত। তবে শুনলাম এবার নাকি একটু বাড়াবাড়ি। বাড়ি এলাম। ও-রোগের কোনো ওষুধ নেই, কাজেই চুপচাপ বসে থাকা। হঠাৎ ইচ্ছে করল জয়াকে দেখতে যাব। অনেকদিন দেখিনি।

ছোট্ট জায়গাটি। মেল থামে না। প্যাসেঞ্জার। চব্বিশ ঘণ্টায় আসার একটি ও যাবার একটি। নামলাম যখন, তখন বিকেল। বড়ো ভালো লাগল আমার, চমৎকার জায়গা।

জায়গা চমৎকার হলেও চৌধুরীমশাইকে ঠিক তেমন ঠেকল না আমার। বিরাট সেকেলে ভাঙা চক-মেলানো বাড়ির সামনের ঘরে নথিপত্র সামনে করে ভদ্রলোক বসেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, একটা কচ্ছপ। মোটা ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, বিরাট কালো চেহারা, ছয় ফুট লম্বা হবে, অথচ পা দুটো কেমন সরু সরু, ভারি বিসদৃশ লাগে। ঘাম পড়ছে কপাল বেয়ে। যেন আলকাতরা চুঁইয়ে পড়ছে।— চেহারা দেখলে লোকটা

যে শিক্ষিত, তা মনেই হয় না। কথাবার্তা বেজায় রুক্ষ, চাষিদের চক্রবৃদ্ধি হারে ধার দিয়ে তেজারতি ব্যাবসা করলে বোধ হয় অমনই হয়।

ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব বন্ধুভাবের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক উঠে আমায় ভেতরে নিয়ে যান আলো-আঁধারির ছক-কাটা লম্বা বারান্দা দিয়ে।— কদর্য কথাটা তখনই সন্দেহ করেছিলাম। সঙ্গে যেতে যেতে অপাঙ্গে লোকটার লক্ষণগুলো মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। উনি বাঁ-পাটাকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে টেনে চলছিলেন, একটা পা বিকৃত।

নানারকম কথা বলছিলেন ভদ্রলোক।

আজ উনি একটু দূরের গাঁয়ে যাচ্ছেন, বিষয়সংক্রান্ত কাজে, আমি নিশ্চয়ই দু-চারদিন থাকব এখানে। এ-সময়ে এদিকের জলহাওয়াটা ভালো থাকে। বর্তমানে সামনের ওই ঘরটায় আমায় বসিয়ে উনি একটু বাইরে যাবেন, কতকগুলো কাজ আছে, সেরে ফেলতে হবে। ওটা জয়ার ঘর। জয়া নেই?— আছে কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে, আসবে এখুনি। তা হলে উনি চললেন। আমি ততক্ষণ একটু—

বসেছিলাম কিছুক্ষণ। সামনে ভেতর-বাড়ির উঠোনটা দেখা যাচ্ছে, এক পাশে নারকেল দড়িতে কতগুলি কাপড় ঝুলছে। ঘরের একপাশে কতকগুলো বোতল পড়ে, মদ। —অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ শুনলাম কাংস্যকণ্ঠে কে কাকে বলছে— "মাগির বড় বাড় বেড়েছে। বলি, কতক্ষণ লাগে এ-কটা বাসন মাজতে? ঘাটের ধারে সে ঘোষেদের ছোঁড়াটা এসেছিল বুঝি!"

অস্ফুটস্বরে কে যেন কী উত্তর দিল। আবার ঝংকার ওঠে।— "থাক, আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। তা আর হবে না?— ওই বাপের মেয়ে তো!— ছোটোলোক, ছোটোলোক। নজর কোনোদিন তো আর উঁচু হল না।— বলি, পয়সা নেই তো বামুন হয়ে চাঁদে হাত কেন?— আমার ঢং কতরকম। পড়াশুনো। বড়ো পণ্ডিত, শাস্তর পড়ে মোক্ষলাভ করবেন। ঝাঁটা মার।" হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। কথ্যমানেরা আমার দৃষ্টিরেখার মধ্যে এসে পড়ে। পুরোনো সেই কাহিনী। আমাদের ভাষায় যাকে খোঁটা দেওয়া বলে।

জয়া। একগাদি বাসন হাতে ছেঁড়া কাপড় পরে জয়া ঘামছে, আর কোমরে হাত দিয়ে মামুলি সেই কোঁদলের ভঙ্গিতে এক প্রৌঢ়া অপরূপ ভাষা ব্যবহার করে যাচ্ছেন। ফুলের মতো মেয়েটার গা দিয়ে খড়ি উঠতে আরম্ভ করেছে, চুল রুক্ষ, চোখ গর্তে, গায়ের রং কেমন রোগগ্রস্ত হলদে। রক্ত কমতে শুরু করেছে।

জয়া। আমার ছোটোবেলা থেকে কত সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে মেয়েটার সঙ্গে। মায়ের একটা অংশ যেন জড়িয়ে ছিল মেয়েটার সর্বাঙ্গে। দোজবরে চৌধুরীমশাই রূপ দেখে বিয়ে করেছিলেন তাকে। সাক্ষাৎ কল্যাণী লক্ষ্মী যে ও। ওর স্পর্শে একটা সংসার যে শান্তিতে ভরে উঠত। সে-খোঁজ নেননি তিনি দেখছি।

জয়া। হাসি পেল আমার।— অজান্তেই বারান্দায় চলে এসেছিলাম।

জয়া আমাকে দেখে অবাক হয়ে যায়।— "তুমি। চলো, ঘরে চলো।"

প্রৌঢ়ার বোধহয় লজ্জা হয়েছিল। সর্বাঙ্গ খালি রেখে এক হাত ঘোমটা টেনে ফিসফিস করে আমার পরিচয় নেন, তারপর তাড়াতাড়ি চলে যান। আমি ঘরে আসি। বাসনগুলো রেখে আসে জয়া।— শুনলাম, চৌধুরীমশাই-এর পিসি উনি। বাড়িতে এই তিনটি প্রাণী। এত বড়ো বাড়িটার জায়গায় জায়গায় বট-অশ্বত্থ-ওঠা ভাঙা দালানের মধ্যে নিঃসঙ্গ জয়া ঘুরে বেড়ায়, গৃহকর্ম করে, পিসিমা মালা জপেন আর অকথ্য ভাষায় জয়াকে গাল দেন এবং চৌধুরীমশাই তেজারতির টাকা গোনেন বসে বসে।

জয়া আমাকে দেখে একেবারে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। দু-হাতের উলটোপিঠ দিয়ে ঘর্মাক্ত কপালের চূর্ণকুন্তল সরিয়ে দেয়। বলে— "কখন এলে তুমি? বাবা কেমন আছেন? খুকুর অসুখ লিখেছিলেন যে, কেমন আছে সে?" আমার মুখের ওপর চোখ বোলায় ও।— "কী রোগাই হয়ে গেছ! খালি অনিয়ম আর অত্যাচার, শরীর টিকবে কেমন করে! একটু শাসনের অভাব হয়েছে। আর যা ইচ্ছে তাই আরম্ভ করেছ। এই কয় মাসেই যেমন হয়ে পড়েছ তুমি, আর কিছুদিনে অসুখে পড়ে যাবে যে!"

বলি না আর, আমার থেকেও রোগা আর অসুস্থ দেখাচ্ছে কাকে। তিলে তিলে মৃত্যু একেবারে অবধারিত।

বাপের বাড়ির খবর নেবার জন্য জয়া উদ্‌গ্রীব। ফুঁ দিয়ে বারান্দার কোণের কাঠের উনুনে চায়ের জল করতে করতে খোঁজ নিতে থাকে সঙ্গীসাথির। একটা মোড়ায় বসে যতদূর জানি বলে যাই। জয়ার কথাবার্তা এখনও তেমনি আছে। সেই ঘাড় একটু হেলিয়ে কথা বলা। কী সুঠাম ঘাড়, ঠিক হাতির দাঁতের তৈরি মনে হয়।

চৌধুরীমশাই ভেতরে এসে চা খেতে খেতে পলিটিক্স আলোচনা করেন। তাঁকে আবার এখনই রওনা হতে হবে সেই দূর গাঁয়ে। আমি আসতে ভালোই হয়েছে। ওরা একা থাকত। অবশ্য তাঁকে এরকম দূরে প্রায়ই যেতে হয় এক-আধদিনের জন্য। জয়াদের একা থাকা অভ্যাস আছে। তিনি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে বিদেয় নেন।

জয়াকে তারপর থেকে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করতে থাকি। অনেক কথা জানবার আছে আমার।

চৌধুরীমশাই মদ খান। প্রচুর খান মাঝে মাঝে। পিসিমা ও-ধরনের কথা বলে থাকেন প্রায়ই। আমি যা শুনেছি তা তো কিছুই নয়, ওর থেকে অনেক বেশি ওকে বলে থাকেন। বাপের দৈন্য নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাঁর প্রতিপদে।— মেয়েটাকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক কিছু এই কয় মাসে।— হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।— আমার মুখটা বোধ হয় শক্ত হয়ে উঠছিল ক্রমে।

অন্য কথা পাড়ে ও। বাড়ির কথা, আমার চাকরির কথা।— সন্ধ্যা হয়ে আসছিল।...জয়া রান্না করতে যায়। আমি একা বসে থাকি। কী পৈশাচিক ব্যাপার! এত মিষ্টি মেয়েকে কেউ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিতে পারে এ আমার ধারণার অতীত ছিল। মাথাটা ভীষণ গরম হয়ে যায়, উঠে পায়চারি করতে থাকি।

জয়ার বিয়ের সময়কার একটা কথা আমার মনে পড়ল। কথাটা ভীষণ এবং এ বিয়েতে আমার আপত্তির প্রধান কারণ একটা।

চৌধুরীমশাইয়ের প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন করেছিলেন এখন বুঝতে পারি। শুনেছিলাম, তিনি উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

কিন্তু এ যে কিছুই নয়, এর থেকে জঘন্য আরও আছে, তা তো জানতাম না।— খানিক পায়চারি করার পর ভেতরে গিয়েছিলাম, যেখানে জয়া বসে আছে। পিসিমাকে দেখলাম না, কোথায় কে জানে! খালি পায়ে ছিলাম, আমার আসা সে টের পায়নি। আমার দিকে পেছন ফিরে সে রান্না করছিল।— আমি আর একটা প্রশ্ন করতে এসেছিলাম। কথাটা আগে মনে ছিল না। চৌধুরীমশাইয়ের এক পা টেনে টেনে হাঁটার কথা মনে পড়ছিল।

নোনাধরা ঝুলে বোঝাই রান্নাঘরের দেওয়াল। কুপিটার শিখা কাঁপছিল বারে বারে, তার সঙ্গে দেওয়ালে কাঁপছিল জয়ার ছায়া। তার অঙ্গাবরণীর পিঠের কাছের ফাঁক দিয়ে ওর অনাবৃত দেহের অংশ বের হয়েছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছিল একটা কালো বিশ্রী মারের খানিকটা।

প্রশ্ন করলাম— "ওটা কী জয়া?"

চমকে উঠে সে আমার দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টি— এ তো জয়া নয়! এ যে— এক মুহূর্তের জন্য জয়ার সেই চোখ দুটো দেখেছিলাম। তারপরই স্বাভাবিকভাবে সে বলল— "ওঃ, হঠাৎ চমকে গিয়েছিলাম।— ও কিছু না।"

"কিছু না কী? পরিষ্কার দেখলাম— "

পীড়াপীড়ির ফলে বেরিয়ে এল কথাটা। চৌধুরীমশাই রাতে মাতাল হয়ে ওকে প্রায়ই মারেন। জুতো দিয়ে।

উঃ, মাথাটা কীরকম দপ দপ করছে। কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে চারিদিক।

জয়া উঠে দাঁড়িয়ে শ্লথ বসন সামলে নেয়।

আগে ওদিকে নজর ছিল না বলেই হোক, কী এখন কুপিটার শিখা অমন কোনাচে করে পড়েছে বলেই হোক, এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝলাম কথাটা। রাগে দৃষ্টিশক্তি আমি হারাইনি। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। এক ঝলক বুঝলাম তখন, জয়া সন্তানসম্ভবা।

আমি যে-প্রশ্ন করতে এসেছিলাম, তা করা হল না আর। জয়ার কাছে জিজ্ঞাসা না করেই বুঝেছিলাম।— সে কলুষিত, অপবিত্র হয়ে গেছে।

জ্ঞান হারাইনি আমি। আমার সামনেটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসে। আগুনের লাল আভা আর কুপির কম্পিত শিখায় কেমন থমথমে লাগছিল সব। অনুভব করলাম জয়া কাতরভাবে আমার হাত ধরে ছিল, আর মনে আছে, উনুনে তরকারিটা পুড়ে ঝামা হয়েছিল, একটা উৎকট গন্ধ বের হচ্ছিল।— গন্ধটা আমায় সব জায়গাতে তাড়া করে ফিরেছে। আঃ...

হ্যাঁ, কী বলছিলাম?— ও,— তারপর শুনলাম জয়া বলছে— "আমার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। বাবার কাছে শিক্ষা আমার, মন কেমন করে সংযত শান্ত করতে হয় জানি আমি। গীতা, বেদসার, উপনিষদের তর্জমা বিয়ের সময় বাবা দিয়েছিলেন, নীরবে সব অপমান আমি বহন করতে পারব। করছিলামও, কেবল তোমাকে দেখে কেমন

চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। আমার স্থৈর্যের স্খলন হয়েছিল। ও কিছু নয়, সামিয়িক ব্যাপার মাত্র— "

নিচু, আগ্রহান্বিত গলায় খুব তাড়াতাড়ি কথাটা বলি। এখনো হয়তো সময় আছে।— "আমার সঙ্গে চল জয়া। চলে যাই আমার ওখানে।"

"তা হয় না"— কম্পিত গলায় উত্তর দেয় জয়া— "তা হয় না। হলে খুবই ভালো হত। বেঁচে যেতাম আমি। না, হাজার হলেও শ্বশুরের ভিটে— "

"ইচ্ছে করছে চৌধুরীমশাইকে মেরে ফেলি— "

"ওকথা বলে না। আমাকে বিধবা দেখতে চাও?"

আস্তে আস্তে চিন্তান্বিত হয়ে উঠি। রাগের আগুন মাথায় নেই আর।

পশুটার কথা কেবল ভাবছিলাম আমি। ও কী করবে তবে?

"তবে তো তোমার এক আত্মহত্যা ছাড়া পথ দেখছি না।"

জয়া কেমন ছিটকে সরে গিয়েছিল। বড়ো বড়ো চোখ মেলে আমায় দেখছিল স্থিরভাবে।

"আত্মহত্যা মহাপাপ।"

আমি হাসলাম।— "কেন?"

"কখন কোন দরকারে আসবে তুমি তাঁর তা তো জান না তুমি!"

"কার?"— অসম্ভব হাসি পাচ্ছে আমার।

"বাবার কাছেই তোমারও শিক্ষা, সে-শিক্ষা একেবারেই তুমি গ্রহণ করনি।"

সত্যিই। সে-শিক্ষা মোটেই গ্রহণ করিনি। একেবারেই না। খুব ধীরে বলি—

"আর-এক পথ আছে— "

কাছে সরে আসি জয়ার। ও আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। ওর গলাটা বড়ো নরম। এত শোকে তাপেও মর্মর পাথরের মতো সুগঠিত, ঠান্ডা। বেশি জোর দিতে হয়নি, ওর গলায় আমার লম্বা আঙুল বসে গিয়েছিল।

ও চেয়ে ছিল বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে, হাত দিয়ে সজোরে আমার হাত টিপে ধরেছিল...এই দেখো নখের ক্ষত এখনও যায়নি।

এক গেলাস জল খাওয়াবে দারোগাবাবু?

হ্যাঁ। জয়া মরে গেল। আমার কোন অনুভূতি ছিল না। ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম ওর অসাড় দেহটা কোলে করে। পিসিমা কোথায় ছিল?— জানি না।

জয়াকে মেরে ফেলা আমার উচিত হয়েছিল কি না বলতে পারি না। তবে ওকে সুখ ও সম্মানদায়কভাবে মুক্তি দেবার ওই একমাত্র উপায় বলে আমার মনে হয়েছিল।

হঠাৎ বাঁচবার ইচ্ছে প্রবল হল। তাই বেরিয়ে এলাম।— পেছন ফিরে তাকালাম ওই বাড়িটার দিকে। সে তার আবছা আলো-আঁধারি নিয়ে, তার লম্বা, টানা বারান্দা আর স্তূপীকৃত দালান নিয়ে কেমন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হল অকস্মাৎ। যেন পরিত্যক্ত

গোরস্থান।

জয়াকে কোলে করে চলে গিয়েছিলাম রেললাইন ধারে। একটা গাড়ি আসবেই কোনো-না-কোনো সময়ে।

কোনোদিন রাতে একা অচেনা রেললাইনের ধারে অতি প্রিয়জনের মৃতদেহ কোলে করে বসে থেকেছ, দারোগাবাবু? আমি থেকেছি। আমার কাছ থেকে শোনো।

কালোয়-নীল মিলে আকাশটা শ্লেট রঙের লাগছিল। সাদা মেঘেরা লম্বা লম্বা সারি দিয়ে কোথায় চলে গেছে— । চাঁদ নেই। ওঠেনি। কিন্তু তারার মৃদু চাপা আলোয় দেখা যাচ্ছিল কিছুদূর পর্যন্ত। পাশে অন্ধকারে পাতাহীন শীর্ণ ডালওয়ালা বাবলা গাছ, ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। পায়ের কাছে বড়ো বড়ো সেবাই গাছের ঝোপ, কিছু সবুজ, কিছুটা পাঁশুটে। সামনে একটা গর্তে জল কালির মতো লাগছে। লাইন দুটো বেঁকে মিশে গেছে আঁধারে,— তাদের ওপর রাতের শিশির পড়ে চকচক করছে। অস্পষ্ট সব আওয়াজ আসছিল দূরে-কাছে থেকে। রাতের ঠান্ডা বাতাস একটা উঠেছিল।—

জয়ার চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। সত্যি বলছি, শেষ মুহূর্তটাতে ওর ভীত, অবাক দৃষ্টি চলে গিয়ে কেমন শান্ত হয়ে এসেছিল তারা, জিভ ওর বেরোয়নি। অমন সুন্দর গলাটা খালি ফুলে গিয়েছিল।— তা হোক, এমন পবিত্র, তৃপ্ত লাগছিল ওকে দেখতে। ওর মাথায় অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে দিলাম আমি। রুক্ষ চুলগুলো, হতাদরে অনাদরে তেল পড়েনি কতকাল। সীমন্তের সিঁদুর মুছে দিলাম। ওটা মানায় না ওকে। এখন বেশ লাগছে! জয়া, কুমারী জয়া। কল্যাণী, মঙ্গলময়ী। যতক্ষণ বসেছিলাম, তার মধ্যে নানাকথা একটার পর একটা মনে পড়তে লাগল। কতদিনের কত বিস্মৃত ঘটনা মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ওপরে প্রেমময় আকাশ তার অজস্র তারার দল নিয়ে ভালোবাসার চাউনি দিয়ে ছেয়ে রইল বিশ্বচরাচর। জয়ার মাথা কোলে করে আমি বসে রইলাম। কতক্ষণ যে কেটে গেল, নিখিল-দৃষ্টি-পরিব্যাপ্ত শান্তি ভঙ্গ করল না কেউ।

অনেক পরে চাঁদ উঠল। আস্তে আস্তে পুবদিক আলো করে চাঁদ উঠল। আর উত্তর দিক উদ্ভাসিত করে একটা ট্রেন দেখা দিল। আমি সন্তর্পণে জয়াকে উঠিয়ে শুইয়ে দিলাম লাইনের ওপর, তারপর কপালে স্নেহময় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম।—

লাইনগুলো যখন থরথর করে কাঁপছিল, তখন শেষবারের মতো ওকে স্পর্শ করে বাবলা গাছটার পেছনে এসে দাঁড়ালাম।

দারোগাবাবু, ট্রেনটা চলে যাবার পর বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল। সব ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই। জয়ার তিন টুকরো দেহটা চাঁদের আলোয় পড়ে রইল, তাকাইনি সেদিকে আমি।

আচ্ছন্নের মতো স্টেশনে এলাম লাইন ধরে। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। ওপাশে নতুন চাঁদের তির্যক হয়ে পড়া আলোয় রেল কোম্পানির কোয়ার্টারগুলো দেখা যাচ্ছিল। লোকজন ক্রমে এসে জমল প্ল্যাটফর্মে। উঠে একেবারে কিনারে চলে গেলাম। গন্ধটা কি ওখান থেকে আসছে? ওই যে কোয়ার্টারটা!— নাঃ সব আলো তো নেভা ও-বাড়ির। পারছি না আর, মাথাটা চেপে আসছে গন্ধে।

কোনো একসময় ট্রেন এল। সেটায় উঠে বসলাম কলকাতার টিকিট কেটে। বাড়ি যাব না। হ্যারিসন রোডের মোড়ে একজন পরিচিত লোক আছে, তার কাছ থেকে চোরাই রিভলবার একটা কিনতেই হবে। যেমন করে হোক, যত দাম লাগুক। গায়ের জোরে আমি পারব না চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে। থানার ওপাশে ওই কি তোমার বাড়ি দারোগাবাবু? বেশ তো বাড়িটি।

কী? তারপর?— তোমরা ধরলে রানাঘাটে। একবারটি ছেড়ে দেবে না আমায়? শুধু একটি বার। একবার দেখি চৌধুরীকে! পশু একটা। সারাটা যৌবন অত্যাচার করে শরীরে জঘন্য কুৎসিত ব্যাধি এনেছে। স্ত্রীর দেহে সেই ব্যাধি সে সঞ্চারিত করেছে। তার বংশধর বিকলাঙ্গ হোক, কিন্তু সারাটা জীবন জয়াকে অসহ্য যন্ত্রণা পেতে হত।— অথচ চৌধুরী নিজের রোগের কথা এবং তার ফলাফল জানত!— তোমরা ছেড়ে দিলে রিভলবারের সব কটা গুলি ওর গায়ে পর পর মারব, প্রথমে পায়ে, তারপর হাতে, তারপর পেটে, তারপর বুকে... তোমরা তো ছাড়বে না।

কিন্তু ওকে মেরেই বা কী হত বলো তো? কী হত?— কিছু না। জয়াকে মেরেও অন্যায় করেছি। কত মেয়ে আছে জয়ার মতো, কত পশু আছে চৌধুরীর মতো।

কিন্তু অন্যায় করেছি কি? বাবার চাকরি হঠাৎ যাবার পর প্রতি বছর পাগল হয়ে তিনি যা কষ্ট পান, তা তো দেখেছি। জয়াকে সে নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেছি। তার রান্নাঘরে এক মুহূর্তের চাউনি আমার কাছে বাবার মুখ মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।...

তোমরা আমায় ফাঁসি দেবে জানি। দাও। দু-হাতে সাঁড়াশির মতো গলা টিপে মারার কষ্ট সহ্য করতে হয় কি তাতে?

আমার ভালো লাগছে না।

— আর কিছু বলার নেই।

ওঃ দারোগাবাবু!— তোমার বাড়িতে বারণ করো তো, কী যেন কী যেন ভারি বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে। ঠিক। তরকারি। ছুটে যাও তো!

দেশ ১৫ বর্ষ সংখ্যা ৩৯ ১৫ই শ্রাবণ ১৩৫৪ পৃষ্ঠা-৫৬৮-৫৭০

শিখা

আমার হাতে তার ছবিটা রয়েছে। একমাথা চুল, মুখে কপালে গালে এসে পড়েছে খানিক। হাতে একটা থালা ধরা, অপর হাত মুখে ঢোকানো। ভরা মুখে হাসিটা চাপা, চোখমুখ ভরা দুষ্টুমিতে।

নাম শিখা। চেহারা দেখে মনে হবে কিন্তু নিতান্ত অসার্থক সে নাম। অবশ্য নামের তাৎপর্য এক মিনিটের আলাপের পরই বোঝা যাবে। এতটুকু তো মেয়ে, বয়েস কতই বা, বড়োজোর সাত, কিন্তু কী দামালপনাটাই করতে পারে।

এ ছবি তোলার সময়টা মনে পড়ছে। ক্যামেরা হাতে নিয়ে ছাদে উঠেছিলাম সামনের পাহাড়ের একটা ভালো ভিউ পাওয়া যায় কি না দেখতে, ফাঁকা ছাদে এই কড়া রোদে দেখি শিখা দেয়ালে হেলান দিয়ে চিলেকোঠার পেছনে বসে একমনে কী চাটছে। অবাক হয়ে গেলাম তাকে এই ভরদুপুরে এখানে এমনভাবে দেখে। ভালো করে চেয়ে দেখি একগাদা ছেঁচো-আম লঙ্কা-নুন সহযোগে গিলছে মেয়েটা। একটু শব্দ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, আমাকে দেখে ফেলে ও।

সে সময়টাতে ওর মুখে আশঙ্কা, লজ্জা আর কৌতুকের যে-সংমিশ্রণ হয়েছিল, অপূর্ব! লোভ সামলাতে পারিনি, একটা ছবি তুলে নিলাম। এই সেই ছবি, কতবছর আগের একটি দুপুরের রূপ-রস-গন্ধকে আর ছোট্ট একটি চুরি করে খাওয়া মেয়ের জীবনের সেই একটা মুহূর্তকে ধরে রেখে দিয়েছে আজও। সে আমি কোথায় তলিয়ে গেছি, সেদিনকার সেই মেয়ে আজ কোথায়? কিন্তু ওর ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, ফিরে গেছি বুঝি সেই দিনে আমি।

দিদির মেয়ে। অনেকদিন আগে খুব ছোটো থাকতে ওকে দেখেছি, তারপর আর দেখা হয়নি। ওরা থাকত তখন সুদূর প্রবাসে। আর আমি তখন কলেজের ছাত্র। ফাইনাল পরীক্ষার পর বেড়াতে গিয়েছিলেম দিদিদের দেশে।

দেখলাম ওকে। আরও দেখলাম ওর অবস্থা বাড়িতে। কোথায় গেলাস-ভাঙা পড়ে আছে, নিশ্চয়ই ওই শিখার কাজ। খাওয়ার আলমারি থেকে খাবার কম পড়েছে, এর পেছনে শিখা আছেই। বাড়িতে বেড়িয়ে ফিরতে ছেলেপুলেদের দেরি হল, শিখা দেরি করিয়েছে অন্যদের।— মেয়েও অদ্ভুত, যত গালমন্দ খায়, তত মুখ গুঁজে বসে থাকে, উত্তর দেয় না। কিছুতেই বলবে না সত্যি কী হয়েছিল।

কিন্তু দিদি যখন ওকে একদিন মারতে গেল আমার সামনে, থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা দিদিভাই, কী করেছে ও?

দিদি বলে, "আর বলিস না, হাড় জ্বালিয়ে খেল। এই চাল বের করে রেখে গেলাম উনি ডাকছিলেন বলে, ফিরে এসে দেখি সারা ঘরময় ছড়ানো চাল আর মেয়ে বাইরের ঘরে বসে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।"

বলি, "আহা, চাল দিয়ে ও কী করবে? বোধহয় কোন বেড়াল-টেড়াল হবে।"

দিদি ঝংকার দিয়ে ওঠে, "তুই ওকে চিনিস না, ভবেশ। এই অবেলায় মিছিমিছি ও বসবে পড়তে? এ ও ছাড়া কেউ না"— দিদির গলা নরম হয়ে আসে শেষের দিকে। তার আমি কি মারি সাধে? একমাত্র মেয়ে, তবু এত জ্বালাতেও পারে। দুদিন থাক, সব বুঝতে পারবি।"

দিদি শিখাকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ও এতক্ষণ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠায়, কোনো জবাবও দেয়নি, মুখও তোলেনি। আমি ওকে আস্তে আস্তে করে হাত ধরে সামনের চেয়ারটায় বসে কোলের কাছে টেনে আনি। বলি, "আচ্ছা, শিখা, তোকে সবাই বকে, না? কেউ তোর কথা শোনে না।"

এত তর্জন-গর্জনেও যা ফল হয়নি, তাই হল একটু স্নেহের উত্তাপে। কাঁদোকাঁদো হয়ে উসকোখুসকো চুল সমেত ধুলো-মাখা মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বলল, "হ্যাঁ, দেখনা ছোটোমামা, ওরা শুধু শুধু আমায় বকে। আমি কিছু করিনি।"

আমি ওর চুলে হাত দিয়ে ঠিক করে দিতে দিতে বলি, "তুমি কিছু জান না এ ব্যাপারের, না মা?"

সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখ গোমড়া হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "তুমি জানবেই বা কী করে, তুমি তো তখন পড়ছিলে।"

ওর ছোট্ট মুখটা দুষ্টুমিতে ভরে যায়। বলে ওঠে, "আমি তো আর ইচ্ছে করে ফেলিনি ছোটোমামা, চালটা ফ্রকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কেমন হাতটা বেঁকে পড়ে গেল। আচ্ছা, ইচ্ছে না করে দোষ করলে পাপ হয় না, না ছোটোমামা?"

বুঝি সব। মাথা নাড়ি। ও ততক্ষণে এ প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় চলে গেছে। অনর্গল বলে চলেছে, "চলো, তোমায় খাদান দেখিয়ে নিয়ে আসি। কালো কালো কয়লা সেখানে, একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, আর কী সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া। লোকগুলো সব কালি-মাখা। জান, দাদা এতবড়ো, এখনও লোকগুলোকে দেখলে আঁৎকে ওঠে। আমি এ— কটুও ভয় পাই না। ওদের সব্বাইকে আমি চিনি। ওপাশের ওই ধাওড়াটায় ওরা থাকে। জান, ধাওড়াতে একটা মেয়ে আছে, কৌশল্যা, তার সঙ্গে আমার ভারি ভাব।"—

দাদা অর্থে শ্রীমান তথাগত। বীরপুঙ্গবের বয়স এখন নয়।

মাথা নেড়ে অতি উৎসাহের সঙ্গে শিখা বলে চলেছে। একটা বলতে বলতে আর-এক কথায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওর মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে সস্নেহে চেয়ে থাকি ওর অদ্ভুত ভঙ্গিতে দম নেওয়া আর কচি মুখ লাল করে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলার দিকে। ওর বাবা এসে ঘরে ঢুকে বলেন— "এই যে ভবেশ। ওকী, ওটা এখানে কেন? যা-যাঃ—"

অনুভব করি আমার কোলের মধ্যে ও শক্ত হয়ে ওঠে। বলি, "— শিখামায়ী, যাও জামা কাপড় বদলাও গিয়ে। বড্ড নোংরা হয়ে রয়েছ।"

ও কাঠ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করি কেন এত হেনস্থা ওর। গরিবের মেয়ে নয় যে বিয়ের কথা ভেবে এখন থেকেই যন্ত্রণা দেবে। তার ওপর

একমাত্র মেয়ে।

জামাইবাবু বহলেন, "আর বোলো না হে! সব মিস্‌চিফের গোড়া হচ্ছে ওই মেয়ে। বাড়ির খুদে গ্যাং-এর রিং-লিডার। অতি শয়তান, একেবারে বিচ্ছু— "

কী বলব? এদেরই মেয়ে।

বাড়ির মধ্যে এক দেখলাম ঠাকুরদার ওপরই শিখার যা একটু আধিপত্য। সে ভদ্রলোক বনং ব্রজেৎ না করে ছেলের হাতে ব্যাবসাপত্তর ছেড়ে দিয়ে নিজের গোঁফটা আর একটা ব্যাকরণ-কৌমুদী নিয়ে বাড়ির একটেরেয় বেশ আছেন। সারাদিন ধরে ব্যাকরণ পড়েন, তাঁর মতে ওর চেয়ে রসাল বস্তু এ নরজগতে নেই। মাঝখান থেকে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো শিখার আবির্ভাব হয় খেয়ালখুশির মাথায়, তারপর ভদ্রলোকের ব্যাকরণের পাতাগুলো শূন্যে উড়তে থাকে, আর সুপুষ্ট গোঁফটা ঝুলে পড়ে। তাও রক্ষে নেই, মাঝে মাঝেই টান পড়ে তাতে। মহাব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

আমার খুব খারাপ লাগত মেয়েটার ওপর অত্যাচার দেখে। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত ওর ঠাকুরদা। তিনি বনেদি বড়োলোক নন, নিজে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন। কাজেই বোঝেন খানিকটা, এবং মনও তাঁর তাই খোলা। কিন্তু দেখলাম তিনিও নিরুপায় তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে এ-ব্যাপার সম্বন্ধে। প্রাণশক্তিতে উচ্ছল মেয়ে, তাকে তার পথ খুলে না দিলে এরকম তো করবেই, এটা ওরা বোঝে না। বড়োলোকের বাড়ি, মেয়েকে মাটির কাছাকাছি যেতে দিতে বাধে। মেয়েও তেমনি, একেবারে ধুলোর দুলালি হয়ে থাকে শত মানা আর বাধার গণ্ডি পেরিয়ে, তার বন্ধুত্ব লুকিয়ে লুকিয়ে চলে কুলির মেয়ে কৌশল্যার সঙ্গে, হোয়াইটএওয়ের বাড়ির খেলনা ফেলে তার খেলাঘর ভরে ওঠে কোয়ার্টজ আর মাইকা-ছেটানো নুড়িতে।

একদিনকার কথা আমি ভুলব না কোনোদিন। ওখানে একটা বুড়ি ছিল, নাম তার ঝব্বুর মা। তাকে আমি চিনতাম। ওর ছেলে ঝব্বু মারা গেছে তিন নম্বর ইনক্লিনেশন ধসার সময় চাপা পড়ে। খবরটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিলেন জামাইবাবুরা, কিন্তু আজকাল চুক্‌লিখোরদের জ্বালায় টেকা যায় না, বলছিলেন সখেদে জামাইবাবু। স্টেটের মাইনিং অফিসারের কানে কথাটা কী করে গিয়ে পৌঁছোল। ভদ্রলোক বাঙালি, অতি সাংঘাতিক লোক এঁদের কাছে, কারণ তিনি নাকি উপঢৌকন গ্রহণ করেন না। ওদিকে সুবিধে হবে না জেনে জামাইবাবুরা তাঁর স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করে বউদি বলে খাইয়ে দাইয়ে নেকলেশ উপহার দিয়ে, নানারকম করে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়েছিলেন। বুড়িকে অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হয়েছিল, কিন্তু সেটা এখনও কাজে পরিণত করা হয়নি। সেদিন দিদি সাড়ম্বরে বলছিল বুড়ির চোরামির কথা। মুখে নানারকম ইনিয়েবিনিয়ে বলে বটে, আসলে কিন্তু চুরি করতে ওস্তাদ। একবার নাকি ওদের বাড়ি থেকে একটা কাপড় চুরি করে পালাচ্ছিল, হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। জামাইবাবু ভালোমানুষ, তাই শুধু গুটি কয়েক চড়চাপড় সমেত গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। মুখে বলেছিল বটে বুড়ি, শীতে কষ্ট পাচ্ছে বলে উঠোনে ছেঁড়া শাড়িটা পড়ে আছে দেখে নিতে গিয়েছিল এবং বলেই নিত। দিদির বিশ্বাস, ওরকম কাহিনী মারের ভয়ে অনেকেই বলে।

সত্যিই তো!

সেদিন শিখাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে যাচ্ছিলাম পাহাড় চূড়োর মন্দিরের দিকে। রাস্তাটা সেখানে অত্যন্ত সরু। একদিকে গ্রানিটের স্তূপ উঠে গেছে খাড়া, আর একদিকে খড়, সামনের বাঁকটা ঘুরে আমাদের সামনে উপস্থিত হল ঝব্বুর মা বুড়ি। লাঠি ধরে ধরে হাঁটে, চোখেও ভালো দেখতে পায় না। আমাকে ও চিনত। ধম্‌কে বলল, "এ লাল, দো রোজসে মুঝে খানা নহী মিলী, আজ উপর গয়ী থী মন্দিরমে, য়ঁহা ভী কুছ নহী হৈ। দে যো কুছ হোয়, ভূখ্ ন সম্‌হাল যাতা!"

ওর কোঁচকানো মুখে একটা করুণ ভাব ফুটে ওঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি ও লজ্জায় আমার দিকে তাকাতে পারছে না। শুনেছি ওর অসম্ভব দাম্ভিকতার কথা, পুত্রগর্বের দাম্ভিকতা। ওর গৌরব ছিল ওই ছেলে, ঝব্বু। সে মদ খায় না, অন্য মজুরদের মতো যা-তা করে পয়সা ওড়ায় না, ইংরেজিতে নাম সই করতে পারে।

দেই বের করে চারটে পয়সা। থরথরে কম্পান্বিত হাতটা শতচ্ছিন্ন কাপড়ের তলা থেকে বের করে পাতে, আনিটা হাতে দেই। ওর ভাঁজপড়া মুখে হাসি-কান্নার অদ্ভুত সমন্বয়। কালচে দাঁতগুলো দেখা যায়, বলে, "জীতা রহো মেরে লাল, রাজরাজেশ্বর বনো।"

ও ঠুকঠুক করতে করতে উতরাই-এর দিকে নেমে চলে যায় চোখ দুটো মুছতে মুছতে। ঝব্বু ছাড়া সংসারে ওর কেউ ছিল না, কেমন করে ওর দিন চলে তাই আশ্চর্য— একবার মনে পড়ে মেদ-স্ফীত জামাইবাবু আর ফ্যাকাসে মুখওয়ালা মাইনিং অফিসারের কথা।

শিখার দিকে নজর যায়। এতক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল, নড়েনি পর্যন্ত। থুতনিটা ধরে মুখ তুলি, টানা দুটো চোখ ভরে গেছে জলে, উপচিয়ে নেমেছে গালের পথ ধরে, বলি, "ও কী মায়ী! কাঁদো কেন? অ্যাই দ্যাখো।" কোলে তুলে নিয়ে চুলে গাল ঘসতে ঘসতে বলে চলি, "কাঁদার কী হল মা? ওকে তো পয়সা দিয়েছি, খাবার-টাবার কিনে খাবে এখন।"

ও হাত দিয়ে জল মোছে। মুছে হঠাৎ পাকা মেয়ের মতো হেসে ওঠে। ওকে নামিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করি। ও প্রশ্ন করে বসে, "আচ্ছা, ছোটোমামা, ওর মতো কত ভিক্ষুক আছে?"

বলি, "অনেক, মা।"

একশো, দুশো, সাতশো— আমার মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সংখ্যা বেড়ে চলে।

বলি, "আরও বেশি মা।" ও নিজের মনে বলে, "আমি। যখন বড়ো হব, বাবার সব টাকা গরিবদের দিয়ে দেব। সব্বাইকে খেতে দেব।"

আমি বলি, "তোমার বাবার পয়সার চেয়েও বেশি ভিক্ষুক আছে।"

ও হতাশ হয়ে বলে, "তবে কী করা যাবে?"—বিপদগ্রস্ত মুখ ওর।

বলি, "সব বড়োলোকদের ধরে তাদের টাকা নিয়ে যদি সবাইকে সমান করে ভাগ করে দেওয়া যায়, তবে হয়তো হতে পারে।"

গুরুগম্ভীর গলায় বলে ও, "তবে আমি বড়ো হয়ে সব বড়োলোকের টাকা কেড়ে

ওদের দিয়ে দেব।"—এতক্ষণের জটিলতা থেকে বেরিয়ে মহানন্দে মাথা আর আমার ধরা হাতটা দোলাতে দোলাতে চলে।

তারপর অন্ধকার। কেবল শেষ যেদিন ওকে দেখলাম, মনে পড়ছে। তখন আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে, পাস করেছি ভালোভাবেই। এরপর আমার ভবিষ্যৎ কী, তা নির্ধারণের জন্য আমার শীঘ্র কলকাতা যাওয়া দরকার।

বাক্স গুছোচ্ছিলাম। শিখা এসে পিঠের ওপর শুয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে। কোনো কথা বলি না, শুধু হাত দিয়ে চুলটা নেড়ে দেই। হাতটা নামাচ্ছিলাম, গালে হাত লাগল। ভেজা।

আস্তে করে পিঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে, কোলে বসাই। বলি, "মায়ী, আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে, না?"

ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে আমার কোলে মুখ গোঁজে। চুপ করে থাকি। খানিকক্ষণ কেটে যায়। ঘরে ঢুকল দিদি। কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ইশারায় চুপ করতে বলি। ধীরে দিদি আবার বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

শিখা মুখ তুলে চায়। বলি, "মাগো, তুমি তো এখন লিখতে পার, আমার চিঠি দিয়ো। আমি উত্তর দেব।"

ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "না, না। আমি যাব তোমার সঙ্গে।"

মহা বিপদ। বলি, "যাবেই তো। তোমার জন্যে ওখানে সব ঠিক করতে হবে তো। আমি আগে যাই, তারপর তোমার বাবাকে চিঠি লিখব তোমায় নিয়ে যেতে, বুঝলে মায়ী।"

বহু কষ্টে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর হাত থেকে সেদিন রেহাই পেয়েছিলাম। তারপর সেইদিনই ওখান থেকে চলে আসি।

কিছুদিন বাদেই শিখার চিঠি পেয়েছিলাম। গোটা গোটা আঁকাবাঁকা কচি হাতের-লেখা একটা এক্সারসাইজ বই-এর পাতা।

—ছোটোমামা তুমি কবে আমাকে নিয়ে যাবে আমার ভালো লাগে না থাকতে এখানে— একটা সোন্দর পাতর পেয়েচি। বুজলে আমার জন্যে একটা এরোপেন কিনো আর একটা টিপ কোশল্লার মতো ঠিক মা ভাল আচে ঝবুয়ার মা মরে গেচে মা একটা গোকুলচন্দ রেকড কিনেচে।

ইতি শিখা

পাশে একটা হিজিবিজি কাটা। ভালো করে দেখলাম, একটা এরোপ্লেন আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

সঙ্গেই পেয়েছিলাম তার বাবার একখানা চিঠি। তাতে অন্য কথার মধ্যে মেয়েকে একটা বিখ্যাত বোর্ডিং-হাউসে পাঠানোর কথা লিখেছেন। যে-জায়গার নাম করেছেন সেটা হচ্ছে শুধু বড়োলোকদের ছেলেপুলেদের জন্যই। সেখানকার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, সেখানে আর সবই হয়, পড়া বা মানুষ করাই হয় না। দেখলাম শিখার ঠাকুরদা আমার সঙ্গে একমত। জামাইবাবু লিখেছেন তাঁর বাবা এই প্রথম কোনো বিষয়ে আপত্তি

করলেন, কিন্তু জামাইবাবু ওকে সেখানে পাঠাবেনই।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, মেয়েটাকে পৃথিবীর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্নবদের রাজ্যে রাখার মানে তাকে মেরে ফেলা। তাতে হয়তো নাচ শিখবে সে, গান করতে পারবে মিহি গলায়, স্টেকে ব্রিজ খেলতে এবং ড্রিঙ্ক টস্-অফ করতেও পটু হবে কালে, কিন্তু সহজ সরল মানুষটি হবে না।— কে কার কথা শোনে। পরে শুনেছিলাম তাকে পাঠানো হয়ে গিয়েছে।

তারপর আজ প্রায় পনেরো বছর কেটে গেছে।

এর মধ্যে আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। বটানির হায়ার স্টাডির জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলাম বহুদিন। ফিরে এসে সম্প্রতি এক অখ্যাত শহরে প্রফেসরি করি আর অবসর সময়ে লিপ্ত হয়ে থাকি আমার বাগানের মূক উদ্ভিদরাজ্যের পেছনে কাজ করাতে।

এর মধ্যে আমার চুলের পাশে পাক ধরেছে কখন, মুখে একটা একটা করে রেখা দেখা গিয়েছে, জানিও না। মা বাবা গত হয়েছিলেন বিদেশ যাবার আগেই, দাদারা যে যার জীবিকা নির্বাহ করছে ছড়িয়ে পড়ে, একমাত্র বোন দিদি বহুদূরে, আমার জীবন ভরে রাখে প্রাণচঞ্চল উচ্চরব ছেলেরা আর মৌন বিচিত্র গাছের দলে ভাগাভাগি করে।

দিদিদের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। আমি যখন ফিরলাম ও-দেশ থেকে, হাওড়া স্টেশনে আমায় অভ্যর্থনা করতে দিদি জামাইবাবুরা এসেছিলেন। আরও মোটা হয়েছেন জামাইবাবু, সেই সঙ্গে স্ফীত হয়েছে ব্যাঙ্কের অঙ্ক আর ক্ষীণ হয়েছে শালীনতাজ্ঞান,— শিখার সম্বন্ধে শুনলাম তার বিয়ে হয়েছে এক ধনকুবের খনির মালিকের সঙ্গে, নাম তার শৈলেন ব্যানার্জি। বোর্ডিং হাউস থেকে সম্পূর্ণ অ্যাকমপ্লিশড্ হয়ে বেরিয়েছিল, খুব সুখে আছে।— এইটুকু মাত্র।

আজ এতদিন বাদে কলকাতায় এসেছি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কতকগুলো বই পড়তে। কাজ আমার শেষ হয়েছে দুপুরেই, বিকেলের দিকে বাসায় ফিরে দেখি আমার জন্য রাখা একটা চিঠি। শিখার, ছোট্ট। তাড়াতাড়িতে লেখা। সে জানাচ্ছে, সে এসে আমায় পায়নি, সন্ধ্যাবেলায় অবশ্য যেন তার সাদার্ন অ্যাভিন্যু-এর বাড়িতে যাই।

গেলাম। বিরাট বাড়ি, সামনে লন, রাতে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থাসমেত। গাড়িবারান্দায় গাল-ভরা নামওয়ালা গোটা কয়েক গাড়ি দাঁড়িয়ে, বারান্দায় উঠতেই দুটো বড়ো বড়ো বিলিতি কুকুর আমায় অভ্যর্থনা করল সরবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুদৃশ্য চাকর, নামের কার্ড না-থাকায় চিটে নাম লিখে নিয়ে গিয়ে বিরক্ত মুখে খানিক বাদে এসে ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরে বসে অনেকগুলো জীব। ঘরের আসবাব থেকে বিত্তশালিতা ও রুচিজ্ঞানের অভাব চিৎকার করছে। ঘরের মধ্যে ট্রেতে বিলোনো হচ্ছে দামি পানীয়, দানছত্র। চুপ করে একপাশে বসে থাকি।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরে শিখা ঘরে ঢোকে।

শিখাই বটে। ঘোর লাল রঙের শাড়ি আধুনিক ধরনে গায়ে জড়ানো, ব্লাউসের মধ্যে

থাকার চেয়ে না-থাকার অংশই বেশি। ঠোটে কদর্যভাবে বিলিতি রং, চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। ঠিক যেন তারই বাগানের মালীর সযত্নরক্ষিত কেয়ারি-করা ফুলগাছটি!

একটা লোকের হাত ধরে ও হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে। হাসির মধ্যে কোথায় যেন সেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, গালের টোলটাই বোধ হয়। আমায় দেখতে পেয়ে সোজা চলে আসে, কষ্ট করে একটু নিচু হবারও চেষ্টা করে, আমি বাধা দেই।

সঙ্গের লোকটা কী একটা বলে। ও উত্তর দেয়, "Oh, Shucks! No more please." তার পর আমার দিকে ফেরে, "ছোট্টমামা, কতদিন পরে দেখা বলো তো?— সল্ বাড়ি নেই, থাকলে আলাপ করিয়ে দিতাম। এঁরা আমার বন্ধু, আজ একটা at home দিচ্ছি কিনা!— খাবে নাকি এক পেগ, It's real Golden Sherry না? Hock? Claret? নিদেনপক্ষে একটা Gingerale?"— মাথা নাড়ি, বলি "আমি অভ্যস্ত নই।" ও হাসে, মুক্তোর মতো দাঁত দেখা যায়, ম্যানিকিওর কথা হাতটা সাবধানে আলতোভাবে গালে রাখে, বলে "You're still old-fashioned, after all these 'Merica and all that sort of rot!" কীরকম চেপে চেপে উচ্চারণ, চালিয়াতি করে বলার চেষ্টা।

ওর সময় বেশি নেই, বন্ধুর দল অধীর হয়ে উঠছে। বলে, "যাই হোক, একটু বোসো, যেও না কিন্তু। Feel yourself at home, please."— কেমন একটা সুর করে শেষের কথাটা বলে ও।

—ও ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠে চলে আসি। আমি জানি ও আমার অভাব অনুভব করবে না।

বাড়ি এসে ড্রয়ার খুলে অতি প্রিয় ছবিটি বের করি, আমার শিখামায়ীর ছবি। সেটা আমার সামনে পড়ে আছে, আর আমার মনে ভেসে যাচ্ছে একটার পর একটা ছবি— তাই দেখছিলাম আবার, বহুবার দেখা টু-হাফ থ্রি-হাফ কাগজের টুকরোটা। অনেক বছর আগে তোলা বিবর্ণ একটা অতি সাধারণ ফোটো। ছবিটার চোখদুটো কী দুষ্টুমিতে ভরা, আর মুখের কোণে যে-হাসির রেখা, তা কী অপরূপ ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছে অনবদ্য একটি শৈশবের মায়াজাল। দেখলেই আদর করে মাথাটা নেড়ে দিয়ে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে করে...

শিখামায়ী আমার নিভে গেছে!

অভিধারা প্রথম বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ পৃষ্ঠা ১৯-২৪

এক্সট্যাসি

পালিয়ে এসেছি। এখানে জীবন নীল, শত সহস্র সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না প্রতি মুহূর্তে।

দেশকর্মী বলে এককালে নাম ছিল। জেলে গিয়েছি একবার আগস্ট-আন্দোলনের সময়। জীবন পণ করেছিলাম তখন। এ-সময় সেকথা ভাবলেও কেমন অদ্ভুত লাগে! তার পর— তার পর কোথা দিয়ে কী যন্ত্রণায় কেটে গেল কয়েকটা বছর। ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ আর বেদনা জাগরূক হয়ে উঠতে লাগল। আর সহ্য করতে পারছিলাম না ওই কান্না আর কান্না। অধীর হয়ে উঠছিলাম ভেতরে ভেতরে। তারপর প্রথম সুযোগেই কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছি।

প্রতিটি দণ্ড এখানে কাটে না চিন্তা আর সমস্যার ঊর্ণাজালে। আমার মনের ভেতরটা কেমন শান্ত হয়ে গেছে এখানে এসে। অলস কল্পনা নিয়ে এখানে আমি ঘর করি। এই মধ্যপ্রদেশের মধ্যতম প্রদেশে, জংলা রুক্ষ প্রকৃতি আর গভীর নীল আকাশের কাছাকাছি থেকে আমি স্থির করেছি, আর আমি ভাবব না ওসব সমস্যার কথা। আমি বাঁচব মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, স্রোতে গা এলিয়ে দিয়ে প্রতি মুহূর্তকে নিঙড়ে তার সব রসটুকু আহরণ করব, যেন একটুও বাদ না যায়।

এখন বসন্ত কাল। এখানে মহুয়া আর পলাশ গাছেরা কী কাণ্ডটাই না বাধিয়েছে! ওদের বিমোহিত চোখে আমি দেখব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরা, কিছু না বুঝে ছুরি খেয়ে শেষ হওয়া, বীভৎসতা আর দৈনন্দিন জীবনের শত-সহস্র বেদনা, এবং তারই পাশে ধনিকের টাকার জোরে সমগ্র শাসনযন্ত্রটাকে হাত করে উল্লসিত উদ্দাম পৈশাচিকতা, এর বিরুদ্ধে আমি কী করতে পারি? আমি বড়ো ক্লান্ত, অবশ। কী হবে ওসব ভেবে?

তার চেয়ে এই ভালো। এখন বিকেল। বসে আছি ঝরনার ধারে। পাথরের টুকরোগুলো রোদ পড়ে চকচক করে, সামনের টিলার ওপর অজস্র মহুয়ার গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, পলাশ ফুলেরা ঝরে বনের উপান্তে, বনের সাজ বনের ফুলেই হয়, আর পরিষ্কার টলটলে জল খাত বেয়ে চলে যায়, এখানে-ওখানে সাদা হয়ে ওঠে পাথরে আঘাত খেয়ে। অপরূপ!

দূরে— যেখানে নীল আকাশ আমার চোখের সীমার বাইরে চলে গেল, সেখানে দেখা যায় টানা টানা পাহাড়দের। কেমন আবছা আবছা! কী একটা রহস্যের সংকেত যেন পাওয়া যায় সবটা মিলিয়ে।

কী ভালো যে লাগছে, বলতে পারি না।

এ সেই কালিদাসের মেঘদূতের দেশ, আমাদের অলকার দেশ। মনে পড়ে যায় ভ্রূবিকারানভিজ্ঞা জনপদবধূদের কথা।

সেইসঙ্গে মনে পড়ে আমার বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরি মানসীর কথা। জীবনের এক-একটা অবস্থায় আমি তাকে এক এক রূপে এঁকেছি। সে কেমন হবে, আমার জীবনের পট-পরিবর্তনের তালে তালে এর উত্তরও বদলেছে। কখনও শান্ত স্নিগ্ধ সাধারণ একটি মেয়ে ; কখনও বা উজ্জ্বল বহ্নিস্বরূপিণী আদর্শদ্রঢ়িষ্ঠা কঠিন এক গৌরী।

কিন্তু এই মুহূর্তে যাকে দেখলাম, সে তো তাদের একটাও নয়। আর কল্পনার তিলমাত্র নেই তার কোথাও। সে আমার সামনে জল নিচ্ছে ঝরনা থেকে। ভ্রূবিকারানভিজ্ঞা তাকে বলা যায়, কিন্তু আর্যরক্তসম্ভূতা শুভ্রবর্ণা সে নয়, একটি গোঁড় মেয়ে।

সামনের টিলাটার ওপারে একটা গোঁড়দের গাঁ আছে জানতাম, এ বোধ হয় তাদেরই মেয়ে। তেল-চুকচুকে কালো চুল, মাঝে সিঁথি করে টেনে পেছন দিকে বাঁধা, স্বাস্থ্যপূর্ণ ঘন কালো তার গায়ের রং, টানা দুটো চোখ। লালে-সাদায় ডুরে শাড়ি তার কোমরে আঁট করে বাঁধা। একজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের চোখে, আকর্ষণ করার মতো হয়তো তার কিছু নেই। তবু সেই শ্যামায়মান অন্ধকারে, সেই বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে, ক্ষণেকের জন্য তাকে নিচু হয়ে জল নিতে দেখলাম যখন, সে এক অনবদ্যরূপে আমার সামনে প্রতিভাত হল। সে যেন এই বনপ্রদেশে পৃথিবীর আদি নারীর প্রতীকরূপে ভেসে উঠল।

সন্ধ্যা ধীরে ঘনিয়ে আসে। মেয়েটি জল তুলে চলে যায় গাঁয়ের দিকে। যাবার আগে পরিষ্কার কাপড়-পরা বিজাতীয় লোকটার দিকে চকিতে একটা চাহনি হেনে যায়। সে চাহনিতে ভরা শুধু কৌতূহল।

সে যাচ্ছে। ওর হাঁটার ভঙ্গি আমার কাছে এত সুন্দর লাগছে! আমি তাকিয়ে থাকি তার গমনপথের দিকে, যতক্ষণ সে উতরাইয়ে নেমে চোখের আড়াল না হয়।

কী হবে আমার অন্যসব বিচার-বিবেচনায়? দূর হোক সব। কাল আমি যাব ওখানে, ওদের সেই গাঁয়ে। আমি যদি ওকে বিয়ে করে সারা জীবনটা ওদের সঙ্গে নেচে আর মহুয়ার রস খেয়ে কাটিয়ে দিই, কোথায় আমার সর্বস্বহানি হবে? সারাটা জীবন ওখানে আমার কাটবে, চিন্তার স্থান থাকবে না, বড়ো বড়ো সমস্যা দেখা দেবে না প্রতি পদে। ওদেরই একজন হয়ে ওদের মাঝে একটা সাধারণ চাষির কাজ করে থাকতে চাই যদি আমি, কী এমন অপরাধ হবে তাতে? মানবগোষ্ঠী যার সন্ধানে বেরিয়েছে—, শান্তি, তা কি ওখানে মিলবে না? আদিম মানুষের ধর্ম আর বিশ্বাস নিয়ে চলব সেখানে, অনেক সমস্যাই থাকবে না তাতে। আজ এই ক্ষণটিতে 'অজ্ঞানতাই আশীর্বাদ' কথাটা কী বিশেষ একটা অর্থ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল!

ওই মেয়েটির নাম হয়তো মংরি, কি রঙ্গিলা, কি ময়না। আমি সারাদিন ওই বড়ো পাহাড়টার তলায় উঁচু-নিচু জমির খানিকটা চাষ করতে থাকব, দুপুরবেলায় খাবার সময় তাকে আসতে দেখব ওই চড়াইয়ের পথ ধরে। সাঁঝ হলে আসব বাড়ি, গাঁয়ের সবার সঙ্গে নাচব আদিম নাচ— পৃথিবীর মানবের প্রথমতম নাচ। বাঁশি বাজবে যেমন বেজে এসেছে চিরকাল, মাদলের শব্দে, মাথায় নাচের নেশা ঢুকে যাবে।

তখন হয়তো কান্নায় কান্নায় পৃথিবী ভেঙে পড়বে। ঘুমের ঘোরেও সে ছটফট করবে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ হয়তো রক্ত-তাণ্ডবে কাঁপিয়ে তুলবে দশ দিক। আমি তার কিছুই জানতে পারব না। আমার ক্ষেতের পাশের রাস্তা দিয়ে মোটর-হাঁকিয়ে-যাওয়া বাবুর দিকে

তাকিয়ে থাকব অবাক চোখে।...

সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত এসে গেল এখানে। সামনের দৃশ্যপট কে যেন অদৃশ্য তুলি দিয়ে আঁধারে আঁধারময় করে তুলল। শলাইয়া, শাল, মহুয়া আর পলাশ গাছেদের ঘিরে নেমে এল মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। আর ধীরে ধীরে অরণ্যে সহস্র প্রাণী উঠল জেগে। গাছের ছায়ার আড়ালে জ্বলতে লাগল খদ্যোতেরা, কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে, কাদের যেন চুপিসারে পা-ফেলার আওয়াজ ভেসে আসে, সমস্ত বনময় চুপি চুপি কারা হাসছে, দূর থেকে ভেসে আসছে মাদলের শব্দ।...

চাঁদ উঠল। হলদে, গোল চাঁদ। ঝরনার আনন্দে আত্মহারা গতি, তার বুকে জ্বলছে হাজার চাঁদ। মিঠে হাওয়া বইছে পুব দিক থেকে। পাশের ফাঁকা জায়গাটিতে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে, পাশে তার আঁধারে গা হেলিয়ে গাঢ়তর আঁধারে মগ্ন পিঙ্গল অরণ্যানীর স্তূপ। সমস্ত ছবিটাকে কে যেন মুছে মুছে আবছা করে তুলল। সবটা মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন একটা *the land of the Lotus-Eaters!* শব্দগুলো সব দূরাগত বলে মনে হয়। একটা হাত নাড়াও এখানে বাড়তি খাটুনি— ধ্যানভঙ্গ হবে এই বিশালতার। আজ এই ঝরনার ধারটিতে বসে মনের মধ্যে প্রবেশ করছে কথাটা, কাজের উদ্যম শুধু নিষ্ফল, চেষ্টার শেষ কেবল নিরাশাতে। পরিবেশে বিরাজ করছে এক অসীম অনন্ত শান্তি। শান্তির এই মহারাজ্যে কিছু নয় আর, বিশ্রাম শুধু, গভীর বিশ্রাম। অলস অর্ধনিমীলিত চোখে দেখে যাওয়া আর কান পেতে ধরতে চেষ্টা করা প্রকৃতির মহাসংগীত।

নাঃ, কালই যাব আমি মেয়েটির খোঁপায় পরিয়ে দিতে পলাশগুচ্ছ। ওখানেই থাকব। হারানো ছেলেটি আজ তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সাত সমুদ্র ডিঙিয়ে, ভীরু মন নিয়ে তার বহুদিনের ভুলে-যাওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর ভ্রূভঙ্গি সহ্য করা এখন কিছুই না। যে-স্বাদ পেয়েছি, যে-রস ক্ষরিত হচ্ছে এই বনে-প্রান্তরে, তার মধ্যে লীন হয়ে আমি পাগল হয়ে যাব।

তবু মেয়েটিকে বিয়ে করে চিরকাল সুখে থাকতে পারব তো!

শনিবারের চিঠি ২০শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৫৪ পৃষ্ঠা ৩৮৩-৩৮৬

রূপকথা

সেই বিখ্যাত পত্রিকা অফিসের সামনে বিরাট গাড়িটা এসে থামল। নামলেন হরনাথবাবু। আমাদের হরনাথবাবু, যাঁর ছবি প্রায় প্রতিদিনই লাট-বেলাটের সঙ্গে একসাথে কাগজে ছাপা হয়। কারণ অবশ্য আর কিছুই নয়, কাগজগুলো তাঁরই। এ দেশের পত্রিকা জগতের সম্রাট তিনি।

এই কাগজটিই কিন্তু তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা, এবং তাঁর ছাপ্পর-ফাড়া সৌভাগ্যের উদয়ও এর থেকেই। কুড়ি বছর আগে তিনি এই পত্রিকাটি ফেঁদেছিলেন। বর্তমানে যখন তিনি নামলেন গাড়ি থেকে, তখন বেশ একটু তীব্র আবেগের আওতায় আছেন বোঝা গেল।

তাঁর বর্ণনা দেই। অতি ফর্সা, অতি মোটা, অতি বেঁটে। ব্লাডপ্রেশার যে আছে তাঁর, তা এখন দেখলেই বোঝা যায়। ফর্সা এখন নন তিনি, টকটকে লাল। কোঁচাটি একবার ঝাড়লেন, ড্রাইভারকে গাড়ি খাড়া রাখতে বললেন, তারপর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গেটের দিকে চলে গেলেন। দারোয়ান তটস্থ হয়ে উঠল। ভদ্রলোক বিশেষ আসেন না এখানে, মাঝে মাঝে যখন আসেন তখন সম্পাদক থেকে দারোয়ান পর্যন্ত পরম বিব্রত হয়ে ওঠে। মেজাজের যা বহর, কখন কী করে বসবেন বলা যায় না। যা খুশি তাই করতে পারেন, উন্নতি থেকে বরখাস্ত পর্যন্ত।

তার ওপর এখন দৃশ্যতই খেপে আছেন। দারোয়ানের পাশ দিয়ে যখন চলে গেলেন তিনি, মদের গন্ধটুকুও পেল সে। পিলে তার চমকে গেল। নির্ঘাৎ কারো সর্বনাশ হবে আজ।

সোজা উঠে তেতলায় চলে গেলেন তিনি।

তেতলায়— সম্পাদকের ঘর ছাড়া আর-একটা ছোটো অফিসঘর, তাতে থাকে একজন টাইপিস্ট আর একজন ছোকরা, যে সম্পাদকের কাছে দর্শন-প্রার্থীদের নিয়ে যায়। ছোকরাটি নতুন, তাঁকে চেনে না। মুরুব্বিয়ানার সুরে তাঁকে বলতে গেল—"কী দরকার আপনার?"

ফলে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় তাকে সরে যেতে হল। দণ্ডায়মান টাইপিস্টকে বলেন হরনাথবাবু— "তোমরা নীচে যাও। আমার একটু কথা-টথা আছে সম্পাদকের সঙ্গে।"

টাইপিস্ট ও ছোকরাকে নীচে চলে যেতে দেখে তবে তিনি সম্পাদকের ঘরে ঢুকলেন। জানেন তিনি, তাঁর অবস্থানকালের মধ্যে তেতলায় কেউ আসছে না। টাইপিস্টটি বড়ো বড়ো চোখ করে ছোকরার সঙ্গে তাঁর সংঘাত দেখছিল, নীচে নেমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সম্পাদক বসেছিলেন তাঁর চেয়ারটাতে। পাশে খোলা জানালা। তাই দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন পাশের পার্কটার ওধারটায়। সেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলবার জন্য জমায়েত হয়েছে। আজ কুড়ি বছর ধরে এই জানলা দিয়ে ওই একই দৃশ্য দেখে আসছেন

তিনি। যারা সেসব যুগে খেলত, আজকের শহরের মাথা এবং পা তারাই। আজ যারা খেলছে, তারা তখন কোথাও ছিল না। শহরের এদিকে আগে বিশেষ বাড়িঘর ছিল না, নতুন পত্তনি হচ্ছে অভিজাত পল্লি। তাঁর চোখের সামনে এক এক করে ওই বাড়িগুলো খাড়া হয়ে উঠল, রাস্তাগুলো লোকজনে পরিপূর্ণ হল। আর বিশ বছর ধরে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পরিবর্তিত হয়েছেন। সেদিনের সেই নবীন উৎসাহী আদর্শবান সাংবাদিক আজ কোথায়, চুলের পাশে পাক-ধরা জীবনযুদ্ধে জয়ী একজন সফলকাম লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি, এই কথাই মনে হয় তাঁর পারিপার্শ্বিক এবং তাঁকে দেখে। এই চেয়ারটি প্রতিদিন তাঁকে বহন করে নিয়ে এসেছে, ওই র‍্যাকেটে প্রতিটি সন্ধ্যা তাঁর ছড়িটি রেখে এসেছেন।

প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁর কত চেনা! এই বাইরেটা, শহরের বাড়ির পর বাড়ি যেখানে আকাশের নীল গম্বুজের সাথে লেগেছে গিয়ে, সাদা সাদা মেঘেরা এখন সেখানে বসবাস করছে, বিকেলের সূর্যালোক পড়ে চমৎকার যারা রূপধারণ করেছে ; ওই পার্ক, ভাঙা রেলিং-ঢেঁকি-দোলনা ছেলেদের ঠেলাগাড়ি সমেত ; এই ঘর, তাঁর প্রতিদিনের সাংবাদিকতার সাথি এটা-ওটা সুদ্ধ— সবকে দেখতে কী ভালোই-না লাগে। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কটি বছর, আর চেষ্টাশীল তাঁর জীবনেতিহাস— তাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে এই সমস্ত।

এই সমস্ত কথাই তাঁর মনে পড়ছে আজ বার বার করে। তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই পুরোনো দিনের লড়াই আর সংবাদ সেবা, এইসব কথাই ভাবছেন তিনি।...

প্রচণ্ড শব্দে দরজা খুলে ঢুকলেন হরনাথবাবু। রাগে ফেটে পড়লেন তিনি।

ভদ্রতার বালাই তাঁর কথাবার্তায় বিশেষ নেই। বললেন—"তুমি—! তোমাকে কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না।"

দরজার আওয়াজ শুনে সামান্য ভুরু কুঁচকে ঘুরে তাকিয়েছিলেন সম্পাদক। হরনাথবাবুর উচ্ছ্বাস শুনেও নড়বার চেষ্টা করলেন না। চেয়ারে বসে চুপ করে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

হরনাথবাবু আবার চিৎকার করে ওঠেন। "তোমার কোনো আক্কেল নেই? কালকে কী সম্পাদকীয় ছেপেছ? সোনাপুরা কটন মিলস্ কার তা জান না বুঝি?"

এতক্ষণ পরে ব্যাপারটা যেন অনুধাবন করে ওঠেন সম্পাদক। নম্রভাবে উত্তর দেন—"ও, কালকের সেই লেখাটার কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমিই লিখেছি নিজে, শুধু ছাপা নয়। কেন, চোরাকারবার আর চাল লুকোনোর ঘাঁটি যে ওখানে এ তো সত্যি কথা! আর ধর্মঘট যে চলছে ওখানে, সে তো মজুররা চোরাকারবার বন্ধ করতে গিয়েছিল বলে। ওভাবে গুলি চালানো, লক্-আউট ঘোষণা করা, তারপর খুব উঁচু মহল থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়ে ধর্মঘট নষ্টের চেষ্টা করা, এসব দেশের লোকের জানা প্রয়োজন বই কী।"

"তুমি কি পাগল হলে নাকি? কী বলছ সব?"

সম্পাদক খুব ছোটো গলায় বলেন— "আজও তো সম্পাদকীয় যাচ্ছে একটি

ওইরকম ব্যাপার নিয়ে।" বাইরের দিকে তাকান তিনি। "বোম্বাই-এর সেই বিখ্যাত কাগজের মালিকের অত্যাচার, জোর করে সাংবাদিকের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা, এর ওপরই লিখছি আমি।"

—"তুমি—" কথা খুঁজে পান না হরনাথবাবু। কপালের শিরাটা ছিঁড়ে যাবে বোধ হয়।

"ইডিয়ট!" তাঁর নজর গেল— "তুমি এখনও উঠে দাঁড়াও নি!"

নির্বিকার মুখে এদিকে তাকান সম্পাদক।—"তা বসুন-না। দাঁড়িয়ে কথা বলবেন কতক্ষণ? ওই চেয়ারটাতে বসুন।"

ঠিক এরকম ব্যবহার সম্পাদকের কাছ থেকে কেন, কোনো কর্মচারীর কাছ থেকেই পাননি তাঁর লম্বা জীবনে হরনাথবাবু। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি।

" তোমায় আমি বরখাস্ত করলাম শুয়োর, বেরিয়ে যাও। সম্পাদক একটা ভুরু তুলে কী যেন বলতে যান, হরনাথবাবু বাধা দিয়ে হাত তোলেন—"কোনো কথা নয়, এই 'মুহূর্তে' বেরোও।"

খুব আস্তে চেয়ার ছেড়ে ওঠেন সুদীর্ঘদেহ সম্পাদক, প্রিয়দর্শন মুখ তাঁর ভাবলেশ শূন্য। ব্রাকেট থেকে ছড়িটা নিয়ে ধীরেই দরজার কাছে যান। একটু দাঁড়ান। তারপর ঘুরে তাকালেন এদিকে।

হরনাথবাবু বললেন— "কী, দারোয়ান ডাকব নাকি?"

সম্পাদক দরজার পাল্লা দুটো দুহাতে ধরে দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিলেন। চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছলেন, তারপর পাঞ্জাবির পকেটে রাখলেন। ছড়িটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে হাতের আস্তিন একটু তুলে দিলেন সন্তর্পণে, যেন ঝাড়লেন তার থেকে ধুলো। অতি ধীরভাবে ঘুরে ঘুরে চিন্তাশীলের মতো চোখ দুটো ছোটো করে তাকালেন একবার হরনাথবাবুর দিকে, তারপর শান্ত ভঙ্গিতে ছড়িখানা হাতে নিতে নিতে বললেন— "আপনি আমায় বিদায় দিলেন? নির্বিচারে কুড়ি বছর ধরে আপনার হুকুম পালন করে গেছি, আর আজ—"

হরনাথবাবুর রাগটা বাইরে বজায় থাকলেও মনে মনে ভারি খুশি তিনি। ওষুধটা ঠিক কাজ করছে। বলদগুলো ঘুরতে ঘুরতে হন্যে হয়ে এক এক সময় অবাধ্য হয়ে ওঠে, চাবুকে তখন তাদের স্বাধিকারপ্রমত্ততা প্রশমিত করতে হয়। এ বলদগুলোর চাবুক কী, তা জানেন তিনি ভালোভাবেই। হাজার হলেও এদের চরিয়েই তো খাচ্ছেন।

স্তিমিত ক্রূরভাবে হাসেন হরনাথবাবু— "আমার দোষ নেই— এজন্যে তোমার অকর্মণ্যতাই দায়ী।— ওরকম নিচু স্তরের লেখা দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রতিভা তোমার শেষ হয়েছে।"

মিটি মিটি করে হাসতে থাকেন তিনি। কুতকুতে চোখ দুটো নাচতে থাকে। বাঁকা-হয়ে-পড়া সূর্যের আলো এসে তাঁর মুখের একপাশে পড়ে অদ্ভুত কতকগুলো রেখাকে আলো-ছায়া ফেলে তুলে ধরে।

সম্পাদক বাঁ হাতে ছড়ির মুঠোটা ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে তাকিয়ে

থাকেন। বেশ দামি মলক্কা বেতের ছড়ি।

আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে বলেন তিনি— "কতকগুলো কথা বলে যাই, আর বোধ হয় সুযোগ পাব না।"

"কুড়ি বছর। অমূল্য কুড়িটা বছর আমার জীবনের এইখানে, এই চেয়ারে বসে তোমার মতো অপরূপ বিদ্যের জাহাজের কাছ থেকে মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে হয়েছে। তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ-র স্বার্থরক্ষার জন্য সত্যি খবরের বদলে সুন্দর সব গল্প তৈরি করতে হয়েছে।

"আমার মনে যে কী লড়াই চলেছে দিনের পর দিন। যাক্, সে-জীবন আর আমার নেই।"

সম্পাদক টেবিলের ও-মুড়োয় এসে থামলেন।—হরনাথবাবু বেশ চমক খেয়ে গেছেন। ঝপাং করে একেবারে আপনি থেকে তুমি! প্রেমের আতিশয্য? তা ছাড়া এটা তো ঠিক সুবিধে বোধ হচ্ছে না!— ওষুধের মাত্রাটা কি বেশি হয়ে গেল?

কী জানি!— তবে এ-কথা স্থিরনিশ্চয় যে এরকম ডিলিরিয়াম আওড়ালেও কিছু সময় যাবার পর আবেগটা থিতিয়ে আসলেই সুর এবং গান বদলে যাবে। পেটে একটু টান ধরুক।— কিন্তু সে তো হল পরের কথা, বর্তমানে এ-চাকরটা যেরকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছাড়ছে, তাতে তো একা ঘরে খুব আরাম লাগছে না!

আর ভাবা গেল না।

আচম্বিতে সপাং করে ছড়িটা এসে পড়ল ঠিক তার মুখে। হরনাথবাবু স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে ওঠেন। পরমুহূর্তে আর-একটা বাড়ি খেয়ে ধপাস করে আবার চেয়ারে বসে পড়েন।...তারপর থেকে কিছুক্ষণের ঘটনাবলি তাঁর কাছে চিররহস্যে ঢাকা থেকে যাবে। কালো কালো পর্দা, তার ওপর নানারকমের আতসবাজি...। বেশ ব্যাপার।

হরনাথবাবু মার খাচ্ছেন। নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ভয়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন সম্পাদকের দিকে।

মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।— কয়েক বাড়ি মারার পর সম্পাদক থামলেন।... আস্তে টেবিলের ওপর নেতিয়ে পড়ছিলেন হরনাথবাবু...মুখে হাতে কয়েক জায়গায় কেটে তাঁর রক্ত পড়ছে।— সংবিত ফিরতে তাঁর কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়।

সম্পাদকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে। এ বুড়ো বয়সে হাত খেলানো তো!—কপালের ঘাম মুছতে থাকেন তিনি, হরনাথবাবু টেবিলের ওপর কাত হওয়া অবস্থায় ধীরে ধীরে হাত বাড়াতে থাকেন টেলিফোনটার দিকে।— সাঁই করে হাওয়া কেটে ছড়িটা এসে পড়ল হাতের ওপর। বাড়ানো হাত জীবনে এই প্রথম হরনাথবাবু গুটিয়ে নেন। তাও অতীব দ্রুতবেগে, অবিশ্বাস্যরকম বেগেই।

সম্পাদক তাঁর বাণী দিতে থাকেন। একটু চেরা অস্বাভাবিক লাগে গলাটা।—"তোমার ওই কুমড়ো-পটাশের মতো চেহারা প্রতিদিন ছাপতে হয়েছে জরুরি খবর সরিয়ে দিয়েও।"

সম্পাদক একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করছেন যেন, এইভাবে তাকিয়ে

থাকেন...“ওইজন্যেই তো একটার পর একটা সম্পাদকীয় ছাড়ছিলাম। তোমাদের সবল অদৃশ্য হাতের সেন্সরের আড়ালে কী চলেছে তারই আভাস একটু পাক লোকে।”

হঠাৎ আবার সেই বিশ্রীরকম ব্যাঘ্রিক মনোবৃত্তিটা ফিরে আসে, তাঁর চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। বুকটা ফুলে ওঠে, টিকোলো নাকের ফুটো দুটো বড়ো হয়ে আসে। যা হরনাথবাবু দেখতে পারেন না, তাই!

“তোমার জন্য আমার কী না করতে হয়েছে, পেটের দায়ে কোন জঘন্য কাজ আমি না করেছি?— কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে গেল পরশু রাতে। তুমিই দায়ী তার জন্য। বুঝলে,—তুমি।” ঝুঁকে পড়েন সম্পাদক। মুঠিয়ে ধরেন সযত্ন রক্ষিত চুলের গোছা। ভরা পদ্মার বাঁধে মারাত্মক ফুটো করার পর তার পাশে বসে জলের আগমন দেখার মতো চোখ করে তাকিয়ে থাকেন হরনাথবাবু ভ্যাবা ভ্যাবা চোখ মেলে। মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে পড়েছে। ঠিক খবরের কাগজে দেখা আমার-আপনার চেনা সেই অমায়িক সুবেশধারী লোকটি নন এখন।

সম্পাদক ওকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে ওঠেন। জানলা দিয়ে দৃষ্টি তাঁর চলে যায় বাইরে।...ছেলের দল খেলেই চলেছে, রাস্তায় লোকজনের কমতি নেই।

হরনাথবাবু হঠাৎ সম্পাদকের পা দুটো জড়িয়ে ধরেন মাটিতে বসে পড়ে।

এটা হরনাথবাবু বহুদিন ধরে অভ্যাস করেছেন, কাজেই সুষ্ঠুভাবে পা-ধরার কলায় মুনশিয়ানা দেখান তিনি।

—কিন্তু অমনধারা চুল মুঠিয়ে টান দিলে কোন ভদ্রলোকটা পা না জড়িয়ে থাকতে পারে? সম্পাদক ওঁকে দাঁড় করিয়ে এক ঠেলায় চেয়ারে বসিয়ে দেন ফের। হরনাথবাবুর কাছে আজ নির্বিরোধী স্বল্প-বাক্ সাংবাদিকটিকে কেমন ভয়ংকর লাগতে থাকে।...কশ বেয়ে তার রক্ত পড়ছে, একটা চোখের ঠিক ওপরে একটা জঘন্য কালো দাগ।...

একটা শেষ চেষ্টা করেন তিনি।— “ভাই, ওসব কথা ভুলে যাও, রাগের মাথায় কী বলে ফেলেছিলাম। যাকে ভালোবাসে, তার ওপরই তো জোর খাটাতে পারে লোক—” হিমশীতল গলায় সম্পাদক বললেন—“চুপ করো। তুমি সবচেয়ে বড়ো ক্রিমিনাল। আমার জীবন একেবারে ছারখার করে দিলে তুমি।—সে পরশু রাতে মারা গেছে, পেটে ছেলে সমেত। অসহ্য যন্ত্রণা পেয়েছিল সারাজীবন, আমার মুখ চেয়ে সয়ে গেছে হাসিমুখে।”

হরনাথবাবু বলে যান খুব তাড়াতাড়ি—“তুমি বরং ছুটি নাও কিছুদিনের, বাইরে ঘুরে এসোগে। মন ভালো হবে।—আমি ভাই চলি।... তোমার স্ত্রী ছিলেন দেবী।—”

সম্পাদক হরনাথবাবুর দিকে চেয়েছিলেন কেমন অস্বাভাবিক স্থিরভাবে। হরনাথবাবুর অস্বস্তি লাগে। সারা মুখে কাটা-ছেঁড়া নিয়ে করুণ অভিব্যক্তি ফোটাবার চেষ্টায় তিনি টলমলায়মানভাবে উঠে দাঁড়ান। মলক্কা কেনের প্রচণ্ড শব্দে নিস্তব্ধ ঘরটা মুখরিত হয়ে ওঠে। কেমন সুতীক্ষ্ণ একটা শব্দ।—অকস্মাৎ হিংস্রভাবে সম্পাদক আবার আক্রমণ করেছেন। প্রতিটি বাড়ি মারছেন, আর বলছেন ভাঙা গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে—ভ্যাম্পায়ার...মুখ জোর করে আটকে রাখার জন্য... তোমার চাকর তোমাকে বিচার দিচ্ছে...এই...এই।”

হরনাথবাবু হাত তুলে বাধা দিতে যান। অত বড়ো দেহটায় সম্পাদক বড়ো কম শক্তি ধরেন না।—একটা শিশুর মতোই তিনি অসহায় বুঝে নিষ্ফল ক্রোধে হরনাথবাবু কেঁদে ফেলেন। সর্বাঙ্গে ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে কাঁদাও বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। আচ্ছন্নের মতো কাত হয়ে পড়ে থাকেন তিনি, প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে অর্ধস্ফুট কাতরানি বেরোতে থাকে মুখ দিয়ে শুধু।...ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে আসে।

এলোপাথাড়ি সম্পাদক মেরে যাচ্ছেন। কোনো দিকে নজর নেই।

...দোতলা একতলায় কর্মচারীর দল তটস্থ হয়ে বসে।

আখেরি মারটা আর হয়ে ওঠে না। চেয়ারের হাতলে লেগে ছড়িখানা দুই টুকরো হয়ে ভেঙে যায় হঠাৎ। মটাস্ করে একটা শব্দ ওঠে।—হরনাথবাবুর দাম কি ওই অত ভালো ছড়িটার সমান হবে?—এটা কী করলেন সম্পাদক!

তাঁর ঘোর ভাঙে।

অসম্ভব হাঁফিয়ে পড়েছেন তিনি। আবেগের মাথায় বড়ো বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছেন। হাতের আধ-ভাঙা ছড়ির টুকরো সম্পাদক ছুঁড়ে ফেলে দেন। একটা অর্ধবৃত্তাকার গতিপথ বর্ণনা করে টুকরোটা সশব্দে ঘুরতে ঘুরতে মেঝেতে গিয়ে পড়ে।

হরনাথবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছে বহু আগেই। রক্তস্রোত তাঁর গা থেকে আস্তে আস্তে নেমে চেয়ারে আসছে...চেয়ার থেকে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে তারা মেঝেতে পড়ছে...মেঝে দিয়ে গড়িয়ে জল যাবার প্রণালীর দিকে এগিয়ে চলেছে সেইসব ছোটো-বড়ো ধারা।

অনেকটা রক্ত।— একটা লাভ হয়েছে, হরনাথবাবুর ব্লাড-প্রেসারের বোধ হয় কিছুটা উপশম হবে।

সম্পাদক কম্পিত হাতে রুমাল বের করে মুখ মোছেন। হাতের আস্তিনটা পরিপাটি করে নামিয়ে আনেন। চুলে একটু হাত বুলোন। তাঁর টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটির দিকে একবার তাকিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যান এবং সেটাকে টেনে আবার বন্ধ করে দেন। রক্তের স্রোত বয়ে যায়,...শেষ সূর্যের জবাকুসুমসঙ্কাশ ময়ূখচ্ছটা উজ্জ্বল করে, উদ্ভাসিত করে তোলে শব্দহীন ঘরটাকে।

ছড়ির টুকরো দুটো পড়ে থাকে মেঝেতে...।

সম্পাদক সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকেন।

ড্রাইভার সম্পাদকের অপস্রিয়মাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ভাবে কতক্ষণ বাদে তার হরনাথবাবু আসবেন এবং এর পর তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। পেছনে প্রেসের তুমুল হট্টগোল।—বিশাল ধারার ক্রমবর্ধমান স্রোতে আর একটি মিলল এসে। আমাদের সেনাবাহিনীতে আর এক সৈনিক।

অগ্রণী নবপর্যায় প্রথম বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা কার্তিক ১৩৫৫

রাজা

অসম্ভব বৃষ্টি নামল হঠাৎ।

অসময়ে। ঠিক ব্যাবসা-কাজের সন্ধানে বেরুচ্ছিল রাজা, বাধা পড়ল। আর বৃষ্টি বলে বৃষ্টি, একেবারে মুষলধারে নামল। মোটা মোটা দড়ির মতো ধারা, এক মুহূর্তে ঝাপসা করে তুলল চতুর্দিক। জল-পড়ার নলটা বেয়ে প্রবলবেগে জল নেমে আসছে, চারপাশে ছিটকোচ্ছে জল। দরজার পাশ থেকে সরে আসে রাজা, কদর্য একটা ভঙ্গি করে বলে, "শা-লা!"

রাজা কবি। রাজা পকেটমার। অর্থাৎ কবি ও পকেটমার একাধারে। একটু বিচিত্র, তবে অসম্ভব নয়। শুধু কবি নয়, কাব্য পাঠক সে। লেখার বিষয়বস্তুও একেবারে নব্য। আর পকেটমারই নয় কেবল, মাতালও বটে। মদের পয়সা জোটাতে পকেট কাটে, কি পকেট-কাটার টাকাটা ওড়ানোর জন্য মদ খায়, ঠিক বলা যায় না।

সব লোকেরই অতীত একটা থাকে। বিশেষ হলেই সেটা ইতিহাস হয়ে ওঠে। রাজা সেদিক দিয়ে দীন। অতি সাধারণ অতীত তার। ভদ্রসন্তান, বি. এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। কারণ, হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করে বসে, পড়াটা কিছু না। অর্থোপার্জনই সব, অতএব কলেজের খাতা থেকে নামটা খারিজ করে নেয়। মা-বাবা গত হয়েছিলেন আগেই। সংসারে দায় নেই কোনো। বাড়ি ছিল একটা, সেটা বেচে দিয়ে কিছু নগদ পকেটে করে রাজা বিশাল ধরিত্রীতে স্থান অন্বেষণে বেরুল। আপাতত কলকাতাই তার কাছে বিশাল ধরিত্রী হয়ে উঠল।

তার পরের কথাটা খুব সোজা। কবি সে, কাজেই জীবন দেখতে হবে, এবং জীবনটা হোটেলের মদের পাত্রে এবং বেশ্যার ঘরে আবদ্ধ আছে, এ তার দৃঢ় ধারণা। যথোপযুক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ জুটতে দেরি হল না। রাজা আমাদের জীবন দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে বিলিতি মালের বদলে ধেনো মদের পাঁইট হল এবং বাঁচবার সহজ উপায়টাও বেরিয়ে গেল। তার পর থেকে সেই রাজা, কলেজ-জীবনের রাজা অতীত আশ্রয় করল, সরু দক্ষ হাতওয়ালা রাজার রাজত্ব শুরু হল।

প্রায় পাঁচ বছরের কথা এ সমস্ত।

চন্দ্র-সূর্যের এক আকাশে ঠেলাঠেলির মতো দুই রাজার এক দেহের অধিকার নিয়ে ঝগড়া মিটে গেছে বহুকাল। আছে একমাত্র ওই কাব্য-প্রীতিটুকু, মদ খেলেই ওডেন, স্পেন্সার, লরেন্স, পাউন্ড, এলিয়ট পড়ে আর আওড়ায়। মোটামুটি এই হল আমাদের রাজা।

সকালবেলাতেই এত ঘনঘটা করে বৃষ্টি আসায় ওর সমস্ত মনটা খিঁচড়ে গেল। সাড়ে-আটটা বাজে। বড়ো রাস্তার ট্রাম ধরতে হবে গিয়ে, দশটার পর অফিসের ভিড় আবার কমবে। ভেজা অবস্থায় অফিসপাড়ায় সারাদিনটা ঘোরাও অসম্ভব। আর পারা যায় না।

আবার স্বগতোক্তি করে, শালার বৃষ্টি—

নাঃ, কমবার কোনো লক্ষণই নেই। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অবিরলভাবে। রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে গেছে। সঙ্গীহীন গাড়িগুলো সশব্দে জলের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। ঢেউ ওঠে। গলির মোড়ে বড়ো রাস্তার ধারটায় নর্দমার নোংরা জল কাঁপতে থাকে। সামনে মল্লিকবাবুদের তেতলার কার্নিসে ভিজে কাক বসে ডানা ঝাপটায় আর আওয়াজ করে। তারও মনের অসুখ।

রাজা মাদুরে আধশোয়া হয়ে চোখ বোজে। কাল রাত একটা অবধি হইচই গেছে, শরীরটা নরম। বেশ লাগছে, এমনই স্থাণুর মতন পড়ে থেকে বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ যদি শোনা যেত! রাজা হাই তোলে।

...রাজা ধড়মড় করে উঠে বসল। কতক্ষণ কেটে গেছে? ঘড়িটার দিকে চায় ও, দশটা বেজে কয়েক মিনিট। মেজাজ ভয়ানক বিশ্রী হয়ে গেল। ভালো লাগছে না কিছু।

...বৃষ্টি ছেড়েছে। রাস্তার জল কমে এসেছে, লোকজন বেরিয়েছে পথে। প্যাচপেচে কাদা, চোখ দুটো জ্বালা করছে। রাজা মুখে জল দিয়ে চুল আঁচড়ায়।

কড়াটা নড়ে উঠল সশব্দে। দরজা খুলে দিলে রাজা, ডাকপিয়োন একটা চিঠি হাতে গুঁজে দিয়ে বিদায় নিলে।

চিঠি?— অত্যাশ্চর্য ঘটনা! একখানা মোটা পুরু কাগজের লেফাফা, তার ওপর সুন্দর মার্জিত হাতে লেখা রয়েছে ওর নাম। ব্যাপারটা কী?

না, বেরুনো হল না। ঘরে ঢুকল রাজা। ভয় ভয় করছে একটু, সাধারণত যা ঘটে থাকে, এ তো ঠিক তার মধ্যে পড়ে না। চিঠি?— সত্যিই! কিন্তু ওকে কে লিখবে?

সবল হাতে ছিঁড়ে ফেলে খামটা। নীল কাগজে সোনালি জলে ছাপানো আমন্ত্রণলিপি। 'বহ্নি-চক্র' সংঘের বার্ষিক ঘরোয়া পুনর্মিলনী। কালকের তারিখ দেওয়া। উলটোপিঠে টানা টানা হাতের লেখায় ছোটো চিঠি।—

এ-চিঠি পাবি কিনা জানি না। পেলে নিশ্চয়ই আসবি।

খুব আশা করে থাকলাম। —সুনীল

'বহ্নি-চক্র'। ওর কলেজ-জীবনের সহপাঠী আরও আটটি ছেলের সঙ্গে মিলে এই ঘরোয়া সংঘটা গড়ে তুলেছিল। কত কথাই মনে পড়ে! তখনকার শত আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে ওই নামটার সঙ্গে। ওরই দেওয়া নাম। বুদ্ধদেব, ওর বন্ধু বুদ্ধ, এঁকে দিয়েছিল সাইনবোর্ডটা। সুনীলদের ঘরে ওদের সেই আড্ডা। কত অধিবেশন, উৎসব! কলকাতা থেকে গাইয়ে আর নাম-করা লেখকদের ধরে নিয়ে যাওয়া, টোটো করে ঘুরে চাঁদা আদায় করা দুপুরের কড়া রোদে, মাঝরাতে ঘাড়ে মই নিয়ে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা।

'বহ্নি-চক্র'। নামটা সঙ্গে করে আনল যেন তার গোটা কলেজ-জীবনটাকে। গৌরবময়...প্রথম যৌবন, ক্রিকেট-ফিল্ড, ডিবেটিং সোসাইটি, সোশ্যাল, সাহিত্য-পরিষদ...। গৌরী, স্নিগ্ধা, মায়া,—কী যেন তার নাম, রোল সাতষট্টি ঠিক মনে পড়ছে না, সহপাঠিনীর দল সার বেঁধে দাঁড়াল। বুদ্ধ, সুনীল, আনন্দ, বিমল— দলের

ছেলেগুলো।

এ ছেলেমেয়েরা কোনোদিন মরবে না, বুড়ো হবে না ওর কাছে, চিরটা কাল ওর মনে তাজা জীবন্ত থেকে যাবে।... বহ্নি-চক্রের সাইনবোর্ডের ডগডগে লাল শিখাওয়ালা চাকাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, মধ্যের সপ্তাশ্ববাহিত রথে উদয়গিরির প্রান্ত সীমায় অর্ধলুক্কায়িত-দেহ বল্লাধারী সূর্যদেব হাসিমুখে চেয়ে আছেন।...

ইতিহাসের সামগ্রী জীবনের স্পর্শ পাচ্ছে।

কিন্তু এ-ঠিকানা ও পেল কোথা থেকে? ওর এ আড্ডা তো কেউ জানে না! ও আবার তলার সইটা পড়ে। সুনীল। ওই তা হলে এখনও সম্পাদক। ওরা কেউ আজও ছাড়েনি সংঘকে।— কিন্তু ঠিকানা পেল কেমন করে?

কিন্তু ও-কথাটাই কি বড়ো কথা? যেখান থেকেই পাক, ওরা ওকে ডেকেছে, বহ্নি-চক্রের অধিবেশনে ওকে ডেকেছে। ও যাবে, হ্যাঁ, ও যাবেই। সুনীল ডাকছে, বুদ্ধ ডাকছে, পাঠ্যজীবন-সখারা ডাকছে ; ওর ফেলে-আসা অতীতটা তার ভালোবাসা-ঝগড়া-হাসি-কান্না সমেত ডাকছে। যাবে ও।

যাবে?— আয়নায় মুখটা দেখে ও। গত পাঁচ বছরের জীবন তার চোখকে ঠেলে দিয়েছে কালিময় গর্তে, সেখান থেকে সেই রাগেই বোধ হয় চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে শ্বাপদের চোখের মতন। মুখের দু-পাশে দুটো কদর্য রেখা। হাসলে কালো ঠোঁটের ওপর সাদা ছাতার পেছনে কালচে মাড়ি আর নষ্ট দাঁতের সারি দেখা যায়। চুলে তেল পড়েনি কত কাল, লম্বা লম্বা চুল যাওয়া কি উচিত হবে?

তা ছাড়া, আর-এক কথা। ওরাও কি এখনও তেমনই আছে? সংসারের চাপে পড়ে সজীবত্ব তাদের কি অটুট আছে? হয়তো রাজা তাদের দেখবে একেবারে অন্যরকম। সে সরল উচ্ছলতা ওদের মধ্যে থেকেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওর মনে ওদের যে-রূপ, সে তো অবিনশ্বর, সেখানে রাজা সে ছেলেগুলিকে ধরে রেখে দিয়েছে আজও।

ঠিক দুপুরবেলায় হতাশভাবে রাজা মদের বোতল খোলে। ওর অনিশ্চয়তা আর দ্বিধার বোধ হয় এর থেকে ভালো ওষুধ আর ছিল না। বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে, উন্মত্ত মস্তিষ্ক জ্বলতে থাকে, থুঁতনিটা থরথর করে কাঁপছে, গলা দিয়ে কী ঠেলে উঠছে। মাতাল হয়ে রাজা কাঁদছে।

কিন্তু সংকল্প তার স্থির হয়ে গেছে। পরদিন ভোরে তার গাড়ি, পৌঁছবে বিকেলে, রওনা হবে আবার ভোরে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

বিকেলবেলায় রাজা নামল মফস্বল স্টেশনটাতে। আকাশ ঢেকে আছে দ্রুত ধাবমান নিচু মেঘে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়াতেই পুরোনো জায়গাটা যেন তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। হাওয়ায় একটা পরিচিত গন্ধ। তাজা সবুজ ভেজা গাছেরা, লম্বা লম্বা ঘাসেরা, রাস্তার কাদা মিলে পাঠাচ্ছে গন্ধটাকে। একেবারে প্রাণের মধ্যে গিয়ে অনুরণন তোলে। কতকাল পায় নি এ মিশ্র গন্ধের আভাস! আশ্চর্য, কাদাকে এখানে বিরক্তিকর তো বোধ হয় না!

রাজা খুশি হয়ে হাঁটতে থাকে। ট্রেনে সমস্ত দুপুরটা প্রায় জেগে জানালায় বসে

কাটিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকে একটা ঘুমের ঝোঁকে এক স্বপ্ন তাকে চমকিত করে তুলেছিল।... তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আবার সেই পুরোনো জীবন। ও যেন আবার তার সেকেন্ড ইয়ারে ফিরে গিয়েছিল।

পরিষ্কার ও দেখতে পেলে, ভাত বেড়ে মা ডাকছেন।

খোকা, অ খোকা, আয়। কতক্ষণ ভাত নিয়ে বসে থাকব?

ও যেন লাফাতে লাফাতে ঢুকল, "কী, বুড়ীয়া মাই! হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে? কী মাছ, ইলিশ? গুড, মাদার, দিয়ে ফেল চটপট, সময় হয়ে গেছে।"

মা পাখা হাতে বসলেন। গরম ভাতে হাওয়া করতে করতে বললেন, "আজ একটু তাড়াতাড়ি আসবি বাবা।"

ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। গালাগালিটায় বেশি অভ্যস্ত সে, এত আদরের সুরে কথা বলাটা ঠিক সুবিধেজনক ঠেকল না তার কাছে। খুব আস্তে আস্তে বলে, "কী ব্যাপার?"

"কাল ষষ্ঠী। তাই বিকেলে একটু কলা-টলা এনে দিবি আর কি।" অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন মা।

জল খেয়ে ঝনাৎ করে গেলাসটা রাখে রাজা, তারপর তড়বড় করে উঠে পড়ে। বলে, "তখনই বুঝেছি। ওসব হবে না। অন্য কেউ যাবে, আমার খেলা আছে।"

তাড়াতাড়ি পালাতে চায় ও।

মা বললেন, "আহা, ওরে বাঁদর, অম্বল খেয়ে গেলি নে?"

"দাও হাতে দাও"—রাজা হাত পাতে।

মার হাসিমুখটা তার পরই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে মিলিয়ে যায়। ওর ঘুম ভেঙে গেছে। গায়ে একটু ঘাম, চোখে একটু জল। আর ঘুম হয়নি।

মা তার কিছুদিন পরেই হাঁপানি-জ্বরে মারা গেছেন। ভালো করে চিকিৎসা হয়নি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনিই ওদের সংসারটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। সারাজীবনটা এক হাতে দশজনের কাজ করে যেতেন। আর সবাইয়েরই মতো অতি সাধারণ মা। রাজা ভাবে, মার মতো লোক মরতে পারেন না। ওর মনের মধ্যে চিরকাল স্নেহময়ী তিনি, তার শত উচ্ছৃঙ্খলতা সয়ে যাবেন, সান্ত্বনা দেবেন শোকে।

শুধু মা কেন, ওর তখনকার আত্মীয়ের দল সবাই তার মনে আজও বেঁচে আছে, কোনোদিন মরবে না। আর বাড়বেও না কোনোদিন সেসব বন্ধুরা। চিরকাল কিশোর বয়সের উদ্দাম পড়ুয়া থেকে যাবে। অস্ফুটস্বরে সে বলে, "যতদিন— যতদিন আমি বাঁচব।"

চির-পরিচিত আবেষ্টনী, প্রতিনিয়ত দেখা খুঁটিনাটি, ওকে আনন্দে উচ্ছল করে তোলে। মেঘের ফাঁক থেকে সূর্যটা হঠাৎ বেরিয়ে এসে কড়া রোদ দিতে থাকে। ঘাসে পাতায় জল চকচক করতে আরম্ভ করল।...

মনে পড়ে যায়, ও বর্ষার পরম ভক্ত ছিল। মেঘ দেখলে ওর মন অকারণ খুশি হয়ে উঠত। কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য তাকে প্রায় পাগল করে তুলত। আশ্চর্য,

এতদিন এ সমস্ত ভুলে সে ছিল কোথা? এই তার জানা প্রিয় যথার্থ স্থান। ওই তো দেখা যায় বনমালী কবরেজের বৈঠকখানা, তারপর থেকে সার দিয়ে ওদের পাড়ার বাড়িগুলো। ওই উঁচু তেতলাটায় থাকত গৌরীরা, এখনও কি আছে?

গৌরী ওর সহপাঠিনী। নম্র সংযত, ফর্সা মেয়েটি, কটা চোখ। দেখতে নিশ্চিতভাবেই সুন্দর নয়। ও কিন্তু তার মধ্যে থেকে কোথায় লাবণ্য বের করে নিয়েছিল খুঁজে। দোহারা ছোটোখাটো মেয়েটির সলজ্জ কথা তার কানে মধুবর্ষণ করত সেকালে। হয়নি হয়তো কিছুই, কিন্তু কলেজের দেওয়াল-কবিদের সমর্থন পেয়ে বেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল তাদের বন্ধুত্বের কথা। এ ভালোলাগার মূল্য হয়তো নেই কিছুই, কিন্তু আজও নিষ্পাপ পবিত্রতার কথা শুনলে গৌরীর কথাই মনে পড়ে যায় তার। কেমন আছে সে, কোথায় আছে? আবেগ ভরে ভাবে সে, ভালো থাকুক, সুখে থাকুক গৌরী, নিষ্পাপ কুমারী গৌরী, কল্যাণ হয় যেন তার।

মোড়টা ঘুরতেই পাড়ায় এসে পড়ে রাজা। ওদের পুরোনো বাড়ি, যেটা ও এখান থেকে চলে যাবার সময় বেচে দিয়েছিল, সেটা পার হয়ে যায়। একটা ছোটো ছেলে খেলা করছে সেই উঠোনে ; ওপাশ থেকে একটি কমবয়সি বড়ো একটি বছর বারো-তেরো বয়সের ছেলেকে উৎসাহিত করছে কোণের গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে। ওদের সেই পেয়ারা গাছ! ওরা এখন ও-বাড়ি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নতুন বাসিন্দা, নতুন মুখ সব।

সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠল রাস্তায়। বড়ো রাস্তার মুখে সুনীলের বাড়ি, উজ্জ্বল আলোর ফালি তির্যকভাবে এসে পড়েছে রাস্তায়। ভেতর থেকে অট্টহাস্য ঝলকে ঝলকে মেদিনী কম্পিত করছে।

সারাটা বিকেল কাদায় কাদায় ঘুরেছে রাজা। চেনা শহরটাকে আবার দেখছে ঘুরে, চেনা মুখ বহু দেখেছে, আলাপ করেছে অনেকের সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে রাজা সোজা ঘরে ঢুকে গেল।—সেই ফরাশটা, দেওয়ালে সেই পুরোনো সাইনবোর্ড। রং কিছু জ্বলে গেছে, তবু ঝকমক করছে। ভেতরের দরজার মাথায় ওর লেখা কবিতাটা, বহ্নি-চক্রের জন্মের সময় লেখা, বসে আছে সুনীল, বসে আছে আনন্দ, কোণ ঘেঁষে বসে বুদ্ধ ; ফরাশের মাঝে বসে বিমল, তার পাশে ছোটো খোকা, অমর, প্রবীর, জিতেন—। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজা এক এক করে চোখ বুলিয়ে গেল, ওরা কেউই বিশেষ বদলায়নি।

পরমুহূর্তে একটা গগনবিদারী শোরগোল। বহুদিনের অদেখা অপ্রত্যাশিত পরম বন্ধুর দর্শনে উল্লসিত আট জোড়া সবল ফুসফুসের স্বাগত হুংকার।

"আরে কে ও? রাজা বটেক?"

"আজু মঝু গেহে শ্যাম আওল।"

"হু-রা— চালাও পানসি! রাজা অ গয়া।"

"কেয়াবত! *Colin clouts come home again!* এখানে বোস—*O Mary, go and put the kettle on. A little tea is indicated.*"

"তারপর, রাজা, চিঠি পেয়েছিলি তবে?"

"রাজা, একটা নতুন কবিতা লিখলাম আজ। শুনতে হবে কিন্তু।"

বুদ্ধদেবই প্রথম অনুভব করলে, ব্যাপারটা বড়ো ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে।

"থাম্ তো তোরা। সবে ট্রেন থেকে নেমেছে, একটু জিরোতে দে।"

জিরোনো হল। অমরের কবিতা শুনল রাজা। আনন্দ পেটুক মানুষ। অথচ ক্রমাগত অজীর্ণে ভোগে, পেটে টোকা মারে আর খায়। তার পেটের অবস্থা শুনতে হল। সকলের খোঁজখবর নিলে। জিতেন নতুন ডেপুটি হয়েছে, ছোটো খোকা প্রফেসর। আনন্দের ব্যাবসা ফুলে উঠেছে, অমর ওকালতি ফেঁদেছে এখানেই। সুনীল কোন ছাত্র-সংহতি সম্পাদক, বেশ নাম করেছে। বুদ্ধ উদীয়মান কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, কাজকর্ম ভালোই করছে। অন্যান্য সহপাঠীদের খবর পেল, জীবিকার্জন করে চলেছে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গৌরীর খবরও পেল, বিয়ে হয়ে গেছে তার।

চোখ বুঁজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে থাকল ও। এই তো সে, স্বপ্নে নয়, বাস্তবে, সব-চেনা জগতে বন্ধুদের মধ্যে বসে নিশ্চিন্তে। ওদিকটায় বুদ্ধ আর অমরে ঝগড়া লেগেছে। হাসি এল ওর। খুব চেনা ঝগড়াটা, প্রায় প্রতিনিয়তের ঘটনা। কবিতা নিয়ে অমরকে খেপাচ্ছে বুদ্ধ। এরা সবাই তেমনই আছে।

সুনীল বলে চলেছে, ওরা প্রতি বছর এ-দিনটিতে এখানে এসে জমে, যেখানেই যে থাকুক-না-কেন। শুধু ওরা আটজন, আর কেউ না। রাজার খবর তো এতদিন পাওয়া যায় নি—

রাজা চোখ খুলে প্রশ্ন করে, "কিন্তু কোথা থেকে পেলি আমার ঠিকানা?"

"কেন? কদিন আগে যে বড়দার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হয়েছিল!"

রাজার মনে পড়ে যায়। মাসখানেক আগে ট্রামের মধ্যে দু-মিনিটের দেখা হয়েছিল বটে সরোজদার সঙ্গে। ঠিকানাও বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি, কেন যে ও সত্যি কথাটা বলেছিল, তা ও জানে না। তিনি তবে ভোলেননি কথাটা।

সুনীল বলে, "ওসব যাক। তুই কী করছিস, বল্? আমাদের মধ্যে সব চাইতে ওস্তাদ ছিলি তুই—"

রাজা বলে। অনর্গল মিথ্যা কথা বলে। এত সুন্দর করে গল্পটা জমিয়ে আনে যে, নিজেরই ভালো লাগে। মধ্যপ্রদেশে কোনো স্টেটে ও মাইনিং অফিসার। মাইনে? মোটামুটি আর কি। ফ্রি কোয়ার্টার, তা ছাড়া এটা ওটা। হ্যাঁ, তবে হঠাৎ বিয়ে করেছে, তাই খবর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ছেলে হয়েছে একটা। ছেলের নাম? ভালো নাম তো রাখা হয়নি, রাজা ডাকে মুন্না বলে, ও খোকন বলে ডাকে। হুঁ, সুন্দরী। আছে ভালোই, পাহাড়ি জায়গা, খাওয়াটা ভালো। মাস দুয়েকের ছুটি পেয়েছে, কলকাতায় এসে আছে। হ্যাঁ, নিয়ে আসবে বউকে, তবে দুদিন বাদে। কাল আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। ওদের কার বিয়ে। রাজা কথা বলছে। রাজা। বহ্নি-চক্রের রাজা। কলেজের দলের নেতা, বন্ধুদের ভালোবাসা আর গর্বের বস্তু। কতদিন পরে দেখা।

তারপর হাসি, গান, তবলা— হারমোনিয়ামের আওয়াজ। রাত বাড়ে। খাবার ডাক আসে। খাওয়া। একসঙ্গে সারি দিয়ে তুমুল হট্টগোলের সঙ্গে নয়টি ছেলে খাচ্ছে।

অনেকদিন পরে কত আনন্দের সঙ্গে খেল রাজা।

অনেক রাতে আর সবাই চলে গেল, আনন্দ আর বুদ্ধ থেকে যায় এখানে। বাইরের ঘরে ফরাশের উপর শুয়ে পড়ে ওরা তিনজন। সুনীল আলো নিবিয়ে ভেতরে চলে গেল।

মধুর, জীবনটা মধুর। দুঃখ মধুর, আনন্দের স্মৃতি মধুর। অজানা কারণে একা একা বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলা মধুর। নিজের অদেখা পৃথিবী সম্বন্ধে অন্যের ভ্রমণকাহিনী পড়া, সেও মধুর।

আজ থেকে হোক তার নতুন পথে যাত্রা। মদ সে আর খাবে না, ক্লেদাক্ত সঙ্গ ছাড়বে। কলকাতাতেই আর ফিরবে না কোনোদিন। একটা চাকরি জুটবে না তার এখানে?...থাকবে, এখানেই থাকবে।— মা, গৌরী, বুদ্ধ, ইংরেজির নতুন অধ্যাপকের লাজুক মুখ,...মা, গৌরী, সুনীল, আনন্দ, কলেজ, প্রিন্সিপালের ভুঁড়িওয়ালা চেহারা, গৌরী, মা...সব কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে তারপরে। কুয়াশা... ঘাস থেকে সুগন্ধ উত্থিত হচ্ছে। জলভরা মেঘের ফাঁক দিয়ে দিয়ে হলদে চাঁদের দুরন্ত যাত্রা,... রামগিরি পাহাড়, উত্তরীয় সম্বল কঙ্কালসার মূর্তি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে, হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, মণিবন্ধ তার কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত...

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

শাপেনাস্তঙ্গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ ॥

যক্ষের শাপবর্ষ অতিক্রান্ত... উড়ে চলেছে কামনার মোক্ষধামে... স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যেখানে অনন্ত সৌন্দর্যের চিরনিকেতন...

পাশ ফিরে শুল রাজা। বুদ্ধের নাক ডাকছে।

...ভোর পাঁচটায় ওর গাড়ি। সাড়ে চারটেতে সুনীল ওকে তুলে দিলে।

শান্ত তপোসমাহিত ব্রাহ্ম মুহূর্ত। রাজা বুক ভরে নিশ্বাস নেয়। পরিষ্কার ঠান্ডা বাতাস। মেঘ জমে আছে আকাশে। বৃষ্টি নামেনি এখনও। রাজা মুখ ধুতে গেল।

মাসিমা রাত থাকতে উঠে চা-জলখাবার করে বসে আছেন। মায়ের জাত! মাসিমার সঙ্গে খানিক গল্প করে রাজা। বড়ো আনন্দ পেলে মনে ও। কয়েক ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু সুধায় রইল ভরে একেবারে। ওকে আসতেই হবে চলে, ও বুঝতে পারে।

সময় হয়ে যায়। বাইরের ঘরে গিয়ে ও কাপড় পরতে আরম্ভ করে। বুদ্ধরা ঘুমোচ্ছে গভীরভাবে। ও ডাকবে না ওদের। বেচারারা বড়ো ক্লান্ত হয়েছে। গেঞ্জিটা মাথায় গলাতে গলাতে ভাবে, ওদের সঙ্গে দেখা করতে আবার আসবে ও। ফিরে আসবে। নিজে নিজেকে বোঝানোর জন্যই যেন আপনমনে বলে, ফিরে আসব। আবার ফিরে আসব।

পাঞ্জাবিটা পাচ্ছে না রাজা। আলনার অন্য কাপড়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে বোধ হয়। খুঁজতে থাকে।

সুনীল এসে বলে গেল একটু দাঁড়াতে। মাসিমা আমসত্ত্ব দেবেন, সেটা ও নিয়ে আসছে। সঙ্গে যাবে স্টেশনে।

ওই পাঞ্জাবিটা, ওই নীল শার্টের তলায়। শার্টটা তোলে ও কী একটা পড়ে গেল বুক পকেট থেকে ওর পায়ের ওপর।

মানি ব্যাগ। একটা মোটা, বোঝাই মানিব্যাগ। সরু দক্ষ আঙুলগুলো শিরশির করে ওঠে, কী করছে বোঝবার আগেই ব্যাগটা তুলে নেয় রাজা। বুকটা একটু কাঁপে। ঘুমন্ত বন্ধুদের দিকে একটা চাহনি হেনে ও ব্যাগটা খুলে ফেলে। একতাড়া নোট। নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাগ, দোকানের ক্যাশ হবে। ব্যাগটা রেখেই দেয় ও নীল শার্টের পকেটে। তারপর পাঞ্জাবিটা পরে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জিভটা মোটা হয়ে গেছে হঠাৎ এর মানে ওর অতীতকে, সুধাময় অতীতকে একেবারে মুছে ফেলা।

কুয়াশাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।— বহ্নি-চক্রের সূর্য-সারথি এক হাতে বল্গা ধরে, আর-এক হাত কশা আর্ধোত্থিত। চোখ দুটো নাচছে আনন্দে, উজ্জ্বল হাস্যদীপ্ত মুখ, কবাটবক্ষের পাশ দিয়ে কুয়াশা ঘৃণ্য বিসর্পিল গতিতে উঠছে— উঠছে। ঢেকে গেল, ছেয়ে গেল মিত্রদেবের মুখ।...মা, গৌরী, মা— মেঘদূত, আনন্দ... সবাই সেই কুয়াশার আবরণের ওপারে চলে গেল। রাজা দু-হাত তোলে তাদের সরানোর জন্য।

অন্য দরজা দিয়ে সুনীল বেরিয়ে ডাকছে। ট্রেনের সময় হল। হাতে একটা কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা আমসত্ত্ব।

“কই, রাজা, দেরি করিস না, যদি যেতে হয়। সময় হয়ে এল।”

“এই যাই।”—রাজার চমক ভাঙে। একটা ঢোক গেলে সে। বেরোবার আগে আনন্দের দিকে সচকিত কটাক্ষে চায়, তারপর পটু আর্টিস্টিক সরু আঙুলে নির্বিকারভাবে ব্যাগটা তুলে নেয় নীল শার্টের পকেট থেকে।

শনিবারের চিঠি ২০শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৫৫ পৃষ্ঠা ৪১৭-৪২৭

পরশপাথর

বনারসীলাল লোকটিকে দেখিয়াছিলেন অনেকদূরে মধ্যভারতের অরণ্যাস্তীর্ণ ভূভাগের এক কোলিয়ারি শহরে।

জীবনে নানা জায়গায় গায়ন করিতে গিয়া কতরকমের লোকই তো দেখিলেন, কিন্তু ঠিক এমনটি আর চোখে পড়িল না। এই নিরালা গৃহকোণে বসিয়া, হাতে যখন কাজ নাই, বারে বারে চন্দ্রকান্ত টাইমকিপারের সেই বিচিত্র বিস্ফারিত চক্ষুযুগলের কথা মনে হয়।

আজ পথে এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইবার পর হইতেই মনে পড়িতেছে চন্দ্রকান্তের কথা।... চক্ষু তাঁহার অতীতের কুজ্ঝটিকা-জাল বিদীর্ণ করিয়া স্বপ্নালু দৃষ্টি মেলিয়া দিয়াছে সেই দিনগুলিতে...যখন দেহে তাঁর যৌবন ছিল... তাঁহার কণ্ঠের কদর ছিল... হৃদয়ে অর্বাচীন আনন্দ ছিল...

...চারিপাশে অপরূপ বন্য প্রকৃতি, যাহার জুড়ি মেলা ভার। প্রাচীন ভারতের বিন্ধ্যারণ্য। তাহারই পর্বতবেষ্টিত এক উপত্যকা। ছোট্ট একটি পার্বত্য নদীকে বেষ্টন করিয়া ছোট্ট একটি জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। উপলক্ষ একটি কয়লা খনি। ইন্‌ক্লিনেশান, লোকো-লাইন, রেলওয়ে ইয়ার্ডের ওয়াগনের সারি, টাইম-অফিস আর কৃষ্ণবর্ণ কয়লার ধুলাও এ-স্থানের আদিম বন্য রূপকে খর্ব করিতে পারে নাই। আধুনিক ইংলিশ বাংলোরও না। সারবন্দি কুলি ধাওড়াও নহে। উত্তুঙ্গ পিঙ্গল পর্বতমালা আর গৈরিক অসম প্রান্তরের হু হু প্রসারের মধ্যে পড়িয়া এইসব নিতান্ত খুঁটিনাটিগুলাও যেন প্রকৃতিতে বন্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইহারই মধ্যে দোলোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া গিয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। গায়ন করিতে হইবে স্থানীয় ইনস্টিটিউটে। একে তো এই পারিপার্শ্বিক, তাহার উপর তাঁহার বাসস্থানটি দেখিয়া তিনি একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে তাঁহাকে তোলা হইল। শ্বেত প্রাচীরে আবদ্ধ বাংলোটি, পিছন দিকে সুদূরবিসর্পী অসমতল প্রান্তর, এখানে-ওখানে ওই দুটি-একটি গাছ দাঁড়াইয়া, আর সামনে রাস্তাটি ঝারসি পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া উঠিয়া গেছে—

বনারসীলাল ঠিক সাধারণ গায়ক নহেন। সত্যকারের আর্ট বোধ তাঁহার ছিল, শিক্ষিত তিনি। প্রথম জীবনে ছবি আঁকিতেন, তাহা ছাড়া নব্যমার্গ সংগীতকারদের অন্যতম বলিয়া তিনি উদারদৃষ্টিসম্পন্নও ছিলেন। এ জায়গাটি এত ভালো লাগিল তাঁর যে, কয়েকটা দিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বেশি নয়, কয়েকটা দিন মাত্র। প্রচুর কর্মকাণ্ডের মধ্য হইতে কয়টি দিন এই নির্জন ঝারসি পর্বতমালার বুকে কাটাইবার চিন্তাও তাঁহাকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথমদিন রাত্রে ইনস্টিটিউটের হলে গান ধরিয়াছিলেন তিনি। দোল-পূর্ণিমার রা

কাফি রাগিণীতে গাহিতেছিলেন—

"আজু কী আনন্দ্ আজু কী আনন্দ্
হোরী খেলত শ্যামর চন্দ ॥"

ঘুরিয়া-ফিরিয়া গাওয়া কলিগুলি মধুর রস-সম্পৃক্ত হইয়া তাঁহাকে আবেশ-আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল।...তাঁহার পার্শ্বে মহম্মদজান তবলায় বোল তুলিতেছেন, পিছনে বসিয়া মনোহরপ্রসাদজী সারেঙ্গি বাজাইতেছেন... তম্বুরায় মৃদু অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া তিনি গাহিতেছেন।... একপার্শ্বে ইঞ্জিনিয়ারবাবু, ওধার দিয়া সার বাঁধিয়া শ্রোতৃবর্গ, আলোটি মিটমিটে, টানা ঘরের প্রান্তকোণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাহিরের চন্দ্রালোকিত রাত্রির সে কী অপরূপ মোহময় সৌন্দর্য...বাসন্তী পূর্ণিমার বনজ্যোৎস্না কী মায়া মাখাইয়া দিয়াছে স্থাবর-জঙ্গমে... নিস্তব্ধ বিশাল আন্দোলায়িত প্রান্তরের ধু ধু দিগন্তলীন বিস্তার।...

হাত নাড়িয়া, মাথা দুলাইয়া আবেশে মুগ্ধ বনারসীলাল শুদ্ধ গাহিয়া যাইতেছিলেন—

"আজু কী আনন্দ্ আজু কী আনন্দ্
হোরী খেলত শ্যামর চন্দ ॥"

...কতক্ষণ যে গাহিয়া ছিলেন তিনি, মনে নাই। কোনো এক সময় গান থামিল। তবলা বন্ধ হইল। সারেঙ্গি নিস্তব্ধ।

সে কাফির পর আর জমিল না কিছু। সকলের ফরমায়েসে কেদারা ধরিয়াছিলেন বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার নিজের কাছেই তাহা আবেগ সৃষ্টি করিল না, মধ্যমের পাকড় আর ধরিল না তেমন করিয়া আঁকড়াইয়া।

সবে আলাপচারি করিতেছেন, তাঁহার নজরে গেল এমন সময়, একেবারে প্রত্যন্ত হইতে একটি লোক সহসা উঠিয়া গেল। এতক্ষণ স্থাণুর মতো বসিয়াছিল, কেদারার বিস্তার ধরিতেই উসখুস করিতেছিল, এখন উঠিয়া গেল। অতি সাধারণ লোক, পরনে খাকি শার্ট ও হাফ-প্যান্ট। বনারসীলাল বুঝিলেন, লোকটা সমঝদার। পাশ হইতে ইঞ্জিনিয়ারবাবুটি গলাখাঁকারি দিয়া একটু হাসিলেন।

বনারসীলাল গাহিয়া যান। কিন্তু সে নিতান্তই আসরে গান। তালের রকমফের তাহাতে অনেক ছিল, তালে মারপ্যাঁচ খেলিতেছিল, উদারার অতি নিচু এবং তারার অতি উঁচু পর্দাগুলি ঘুরিয়া-ফিরিয়াই আনাগোনা করিতেছিল— শ্রোতার দল বাহবা দিতেছিল খুব, কিন্তু কোথায় যেন কী একটা পদার্থের অভাব থাকিয়া যাইতেছিল তবু।

...বহু রাত্রে আসর ভাঙিল। চাঁদ মধ্য আকাশে। পর্বতবেষ্টিত সে-স্বপ্নপুরী তখন প্রগাঢ় সুষুপ্তিমগ্ন। দূরের চাংভাখার পর্বতশ্রেণী দেখা যায় অস্পষ্ট। তাঁহারা বাড়ি ফিরিতেছিলেন— বাঁকটা ঘুরিতেই অকস্মাৎ একটা লোক আগাইয়া আসিল। সেই উঠিয়া-যাওয়া লোকটি। কাছে আসিয়া নমস্কার করিল।

"নমস্কার ওস্তাদজি, আপনি আছেন শুনলাম কয়দিন। কাল দুপুরে যদি আপনার হাতে সময় থাকে তো আসতে পারি। কাফিটা আর-একবার শোনার বড়ো ইচ্ছে।"

স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া, সে কথাগুলো বলিল। অন্ধকারের মধ্যে তাহার চক্ষু দুইটি কেমন অস্বাভাবিক নিশ্চল বোধ হইতেছিল। কী বিচিত্র চোখ, কী উজ্জ্বল!

উত্তর দেন তিনি, "নিশ্চয়। কাল দুপুরেই আসবেন। আমার কাজই তো আনন্দ দেওয়া।"

লোকটি নত হইয়া আবার নমস্কার করিয়া, তারপর চড়াই ধরিয়া উঠিয়া যায়। সে দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই ইঞ্জিনিয়ারবাবু সশব্দে হাসিয়া ওঠেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহেন বনারসীলাল। "কী ব্যাপার?"

"ওর পাল্লায় পড়েছেন, আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। লোকটা টাইমকিপার, খাদানের অ্যাটেনড্যান্স রাখে। গানটান করে, তবে বদ্ধ উন্মাদ। আবোল-তাবোল সব বকে খালি। এখন আর পাত্তা পায় না এখানে, তাই নতুন লোক দেখতে পেলেই ধরে।"

হাঁটিতে হাঁটিতে বনারসীলাল বলেন, "গান শুনতে চাইল যে। ওর আসায় আপনার আপত্তি নেই তো?"

"আরে না, না। কী যে বলেন, ওস্তাদজি।"

আর বিশেষ কথা হয় না। সকলেই নীরবে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন।

পরদিন সকালে মহম্মদজান তবলচি ও মনোহরপ্রসাদজি চলিয়া যান। একা বনারসীলাল রহিয়া গেলেন। তম্বুরা এবং তিনি। দর্শনার্থী আগন্তুকের ভিড় হয় সকাল হইতেই। ইঞ্জিনিয়ারবাবু সকাল হইতেই অফিসে।

ক্রমে সকাল কাটিয়া যায়, দুপুর গড়াইয়া আসে। লোকজন বিদায় হয়। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর আবার ইঞ্জিনিয়ারবাবু রওনা দেন। এইবার তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসে, গতরাত্রের লোকটি কখন আসিবে?

দরজার পাশে কাশির আওয়াজ হয়। লোকটি। ক্যাম্বিসের মেটে রঙের জুতা সন্তর্পণে খোলে, তার পর প্রবেশ করে ঘরে। আজ দিনের আলোয় দেখেন তিনি, লোকটার চক্ষুদ্বয় সত্যই কিছুটা অস্বাভাবিক, বিস্ফারিত।

নম্রভাবে একটু হাসিয়া লোকটি নমস্কার করে।—আজ্ঞে, কালকের কথামতো গান শুনতে এলাম। আমার নাম চন্দ্রকান্ত সরকার, এখানে কেরানিগিরি করি। সকালে আসতে পারিনি, কারণ ডিউটি ছিল।"

বনারসীলাল বলেন, "আসুন-না। গল্পসল্প করি কিছুক্ষণ, তার পর গান ধরা যাবে, কী বলেন?"

লোকটি কৃত-কৃতার্থ মুখভাব করিয়া ফরাশের একপার্শ্বে বসে। "আপনার অসুবিধে না হলে আগে সংগীতচর্চাই হোক। গল্প আর কী করবেন?—আপনার আপত্তি নেই তো?"

"না, না আমার কী? তা বরং কাফি আলাপই করি। সংগত নেই, গান জমবে না। তা ছাড়া আলাপেই তো রাগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।—ধরি, কী বলেন।"

তম্বুরা টানিয়া লইয়া শুরু করেন।—কাফির স্বরগ্রামের কুহকে ঘরটি যায় ভরিয়া। একটা পূত পবিত্রভাবে বনারসীলাল যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসেন।...বহুক্ষণ কাটিয়া যায়। গান শেষ করিয়া মুদ্রিত চক্ষু ধীরে উন্মীলিত করেন তিনি। হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া তেলচিটা খাকি হাফপ্যান্ট আর শার্ট-পরা চন্দ্রকান্ত তখনও নীরবে বসিয়া আছে।

অকস্মাৎ ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করে সে, "আচ্ছা, গান শুনলে আপনার কোনো অদ্ভুত কথা মনে হয় না?"

"তার মানে?"

"এই ধরুন কতকগুলো ছবি আমার মনে আপনার গান শুনতে শুনতে জেগে উঠছিল। সুরেলা শব্দ মাত্রেই, এমনকী শাঁখের আওয়াজও আমার মনে ছবি এঁকে দেয়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না তো? মুশকিল—"

ঢোঁক গিলিয়া ও থামে। তারপর হঠাৎ সাগ্রহে ঝুঁকিয়া বলে আবার, "কথাটা ঠিক বলতে পারছি না। অনেকটা অনুভূতির ব্যাপার। ধরুন, একটানা একটা শাঁখের শব্দ আর ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই আমি দেখতে পাই একটা মন্দির...ধূপের ধোঁয়া...আরতি—"

হাত উলটাইয়া-পালটাইয়া সে বলিয়া চলিয়াছে, বনারসীলাল অবাক হইয়া শুনিতেছেন। মুখে সায় দেন, "হ্যাঁ, বুঝলাম। একাগ্রমনে গান শুনলে মনে ওরকম হওয়া অসম্ভব নয়।"

খুব খুশি হইয়া ওঠে চন্দ্রকান্ত।—"হ্যাঁ, বলুন। হতে পারে তো।"—উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ওঠে সে—"এখানে একদিন এই কথাটা বোঝাতে গিয়েছিলাম। ফলে পরদিন থেকে আমাকে যে দেখে, অদ্ভুত করে তাকিয়ে থাকে—"

চন্দ্রকান্ত হাসিতেছে। এমন মজাটা যেন আর হয় নাই। উজ্জ্বল চোখের কোণে বিচিত্র কতগুলো ভাঁজ, মাথাটা ঈষৎ হেলাইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়াছে সে।

হঠাৎ আবার গম্ভীর হইয়া বলিতে থাকে, "ছবি তৈরি করার থেকেও কিন্তু বড়ো জিনিস আছে সুরের মধ্যে।—মানুষের উপকারী জিনিস যা তা ছাড়া অন্যের চর্চা করাও অপরাধ। মানুষকে সুর কিন্তু বাঁচিয়ে পর্যন্ত দিতে পারে। একটা ব্যাপার হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, ছোটো ছেলেরা গান শুনলে একটা অপূর্ব ভাব জাগিয়ে তোলে সুর। এসব মনের ওপর সুরের কাজ। কিন্তু দেহের ওপরও সুর অসীম প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যা দেখেছি আমি, মানে—"

আচমকা লোকটা থামিয়া যায়। তাঁহার চোখের দিকে চকিতে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করে। তাহার এক মুহূর্তের চাহনি, ঠিক বদ্ধ উন্মাদের ক্রূরদৃষ্টি যেন।

দাঁত বাহির করিয়া একটা হাসার ভঙ্গি করে। তারপর দ্রুত বলিয়া যায়, "ও-সব থাক। পরে বলা যাবে। এখন তা হলে আসি—"

একটু অবনত ভঙ্গিতে হাঁটিয়া ঘরের বাহিরে যায়। জুতা পরে। বিনত নমস্কার করে। তাহার পর চলিয়া যায়।

বনারসীলাল তাকাইয়া থাকেন নীরবে।

পরের দিন। বহু লোকের সঙ্গে চন্দ্রকান্তও তাঁহার ঘরে বসিয়া। বেলা প্রায় তিনটা। ইঞ্জিনিয়ারবাবু কোলিয়ারি দেখাইতে তাঁহাকে লইয়া যান। চন্দ্রকান্ত নীরবে তাঁহাদের সঙ্গ লয়— আজও মনে পড়ে সেই একবার দেখা ভূগর্ভের গহন গহ্বরের কথা।

কালো কালো কয়লাদের ভুলিবেন না তিনি কোনোদিন। মেন ইনক্লিনেশানের

মুখে ফ্যানরুম, হাজরি অফিস, লোকো লাইন— একটা ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বহিতেছিল।

তাঁহাদের দলটি ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকে। চারিপাশের ঘুরঘুট্টি আঁধারের মধ্যে সেই যে জল চুঁয়াইয়া পড়িতেছিল, সেটা মনে পড়ে। এখানে-সেখানে প্রধান সুড়ঙ্গ হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া গিয়াছে, কুলির দল কাজ করিতেছে, ট্রামের মতো লোকোগুলি বোঝাই হইয়া বাহিরের দিকে আসিতেছে, খালিগুলি ভিতরে যাইতেছে...দু-পার্শ্বের দেওয়াল কী ঘনকৃষ্ণ। দেখিলে মনে হয়, যেন অন্ধকার কক্ষে চোখ বুজিয়া আছি।— একেবারে শেষ দিকটায়, যেখানে তখন কাজ চলিতেছিল, সেখানে পৌঁছাইলেন তাঁহারা। অভাবনীয় কৃষ্ণতার মধ্যে এতটুকু সেফটি ল্যাম্পের আলোতে যন্ত্র দিয়া সামনের দিকে দেওয়ালে গর্ত করা হইতেছিল। অল্প আলোয় গাঁইতির আঘাতে অসমতল সুড়ঙ্গের দেওয়াল এখানে-সেখানে চকচক করিতেছিল, ভারি বিচিত্র লাগিতেছিল বনারসীলালের।

তাহার পর সেই বিস্ফোরণ! গর্তগুলিতে গান-পাউডার পুরিয়া দিয়া এ-গলি সে-গলি করিয়া তাঁহাকে লইয়া সকলে অনেক দূরে চলিয়া আসিল। শুধু একজন পলিতায় অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য রহিয়া গেল।— খানিক পরে সেই শব্দগুলি, এক এক করিয়া ছয়টি শব্দ ছয়টি গান-পাউডারের টোটা। রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল পর্বতগাত্র, পায়ের তলায় মৃত্তিকায় স্পন্দন জাগিতেছিল, একটা চাপা গুমগুম ধ্বনি নানা স্থানে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে মিলাইয়া যায়।

তাঁহারা দেখিতে যান স্থানটি। স্তূপীকৃত হইয়া আছে সুচিক্কণ কৃষ্ণ কয়লার বড়ো বড়ো টুকরা। পর্বতগাত্রের অনেকটা অংশ ধসা।

সহসা পাশ হইতে কে যেন ডাকিল। ঘুরিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিতেছে, "ওস্তাদজি কেমন লাগছে দেখতে? আমার কিন্তু এই ধসা দেখতে ভারি আনন্দ হয়। টোটা ফাটার শব্দটা এত সুন্দর। তা ছাড়া মানুষ ভেতর থেকে তার জীবনীরস আহরণ করছে, দেখতে এত—"

কুলিগুলি গাঁইতি দিয়া কয়লা ভাঙিতেছে, সরাইতেছে। সেইদিকে তাকাইয়া বনারসীলাল জবাব দেন, "হুঁ।"

চন্দ্রকান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।—"চাপা গুমরিয়া ওঠা শব্দটা যখন চারিপাশ থেকে আসতে থাকে, আর চাপ ধসার হুড়মুড় আওয়াজে মাটি কাঁপতে থাকে, তখন আনন্দে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।"

বনারসীলাল মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে তাহার মুখের দিকে চাহেন। চোখ দুইটিতে একটা ল্যাম্পের মৃদু আলোক পড়িয়া খদ্যোতের মতো জ্বলিতে থাকে। কেমন অস্বাভাবিক লাগে তখন। উহার সন্তর্পণে বলার ভঙ্গি আর নিচু গলার স্বর মাটির অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া কালো নিস্তব্ধ সুড়ঙ্গ-মধ্যে তাঁহার সেদিন কেমন অদ্ভুত বোধ হইতেছিল।

ইঞ্জিনিয়ারবাবু বলিলেন, "তা হলে চলুন। মোটামুটি তো দেখা হল।— কী চন্দ্রকান্ত, যাবে নাকি তুমিও?"

"চলুন স্যার।"

সবাই মিলিয়া বাহিরে আসিলেন। উন্মুক্ত পৃথিবী আবার। আলোয় হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়া যায়। ইঞ্জিনিয়ারবাবু আবার বলেন, "চন্দ্রকান্ত, ওস্তাদজিকে তুমিই বরং পৌঁছে দাও। আমি একবার অফিসে যাব।"

"আচ্ছা স্যার।"

বৈকাল শেষ হয় নাই তখনও। দুজনে পার্বত্য পাকদণ্ডী বাহিয়া খনির উপরকার পাহাড়টায় চড়েন। তাহার ওধারটায় তাঁহাদের গন্তব্যস্থল।

চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করে, "আপনার হাতে কোনো কাজ আছে, ওস্তাদজি?"

বনারসীলাল উত্তর দেন, "না। কেন বলুন তো?"

"তা হলে একটু বেড়িয়ে যাওয়া যেত, এই আর কী।"

ঝারসিনালার খোঙ্গাপানি প্রপাত আপনি দেখেছেন? অনেকদিন আগে প্রথম কয়লার খোঁজ যেখানে পাওয়া যায়।"

"না দেখিনি তো।"

"এখানে দেখবার মতো জায়গা ওটা। সৌন্দর্যের জন্য তো বটেই, তা ছাড়া একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে তার। বহু বছর আগে একজন পোলিশ প্রস্‌পেক্টর হাঁপিয়ে গিয়ে ওখান আশ্রয় নেন, তারপর হঠাৎ একটা কয়লার স্তর দেখতে পান। কাছাকাছি অঞ্চলে খোঁজ করে খনিটার পরিধি আবিষ্কার করে ফেলেন। সেই স্তর দেখার পরই।"

হাঁটিতে থাকেন তাঁহারা। অদ্ভুত লোক এই চন্দ্রকান্ত, ভাবেন বনারসীলাল। কৌতূহল জাগে মনে।

জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, আপনার কাহিনী তো আমায় বললেন না।"

"কাহিনী আর কী। অতি সাধারণ ঘটনা।— কুমিল্লা জেলার গাঁয়ে বাড়ি আমার, গুরু ট্রেনিং পাস করে গাঁয়েই মাইনর ইস্কুলে মাস্টারি করতাম। হঠাৎ কী খেয়াল হল, একটা বড়ো কন্‌স্ট্রাক্‌শন কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে চলে গেলাম সেকেন্দ্রাবাদের বেগমপেটে। বেশ কাজ করছিলাম, আবার একদিন এক ঘটনার পর সে-চাকরিও ছেড়ে দিলাম। তারপর একটা ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি বছর-দুই।"

উহার জীবনযাত্রা প্রণালী শুনিতে বনারসীলালের ইচ্ছা হয়। বলেন, "আচ্ছা, আপনি মাইনে পান কত?"

"আজ্ঞে, পনেরো টাকা হপ্তা।"

"তাতে চলে আপনার?"

"একা মানুষ, না চলার তো কারণ নেই।"

"কীরকম আন্দাজ খরচ পড়ে এখানে থাকতে?"

"কোম্পানি থেকে কোয়ার্টার করে দিয়েছে, খাওয়া খরচ মেসে গোটা পঁচিশেক করে মাসে। জামাকাপড়ের বালাই নেই আমার, ও বখেড়া চুকিয়ে রেখেছি। দুটো খাকি হাফ প্যান্ট আর দুটো শার্ট করে রেখেছি, একটা পরি আর একটা কাচি। বাড়িতে ব্যবহারের জন্য একটা লুঙ্গি, ব্যস।"

"তবে তো অনেক বাঁচে। করেন কী তাতে?"

"আজ্ঞে, পুষ্যি তো নেই আমার। পোস্টাপিসে রাখি।" কী মনে হয় বনারসীলালের। বলিয়া বসেন, "কেন, বাড়ি-টাড়ি যাবার জন্য নাকি?"

চন্দ্রকান্ত থমকিয়া মুখের দিকে চাহিয়া কী যেন বলিতে যায়। তারপর অস্ফুট শব্দ করিয়া সামনের দিকে চায়।

পাহাড়টা সেস্থানে ঢালু হইয়া সমতলে নামিতেছে। খানিক দূর হইতে আবার ঝারসি পাহাড়ের আরম্ভ। মাঝখানে রাস্তার ধারে খনি-শ্রমিকদের খোলার ছাউনি-দে ' '' ধাওড়া। ধাওড়াটার ধারে একটা জটলা, কতকগুলি শ্রমিক, দু-একটি স্ত্রীলোককেও দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের দেখিয়া একটা লোক দৌড়াইয়া আসে। লম্বা, দোহারা চেহারা। চন্দ্রকান্তকে সেলাম করে।

"হুজুর, মাতাদীনকো করেত্ সাঁপনে কাটা হৈ!"

তাঁহারা দুইজনেই চমকাইয়া ওঠেন। চন্দ্রকান্ত ছুটিয়া যায়। বনারসীলাল তাঁহার পিছনে।

তাঁহারা যাইতেই ভিড়টা একটু সরিয়া পথ করিয়া দেয়।...একটা হিন্দুস্থানি শ্রমিক অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, কশ বাহিয়া অল্প ফেনা গেঁজাইয়া উঠিতেছে ধীরে। সর্বাঙ্গে তীব্র বিষের লক্ষণ।—পাশে বসিয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। এতক্ষণ বুক চাপড়াইতেছিল আর মৃদুস্বরে গোঙাইতেছিল। উহাদের দেখিয়া অনেকটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সামনের মাঠে কামড়াইয়াছে সাপে, একজন এখানে আনিয়া ফেলিয়া গেছে শুধু, এতক্ষণ কোনোরকম চেষ্টাই হয় নাই।

পায়ের বুড়ো আঙুলে কাটিয়াছে সাপে।— চন্দ্রকান্ত পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দেখিতে থাকে। তারপর মাথা না তুলিয়াই হাত বাড়াইয়া খানিকটা ন্যাকড়া চায়।— একজন কে ছুটিয়া যাইতেছিল ধাওড়ার দিকে, বৃদ্ধা নীরবে তাহার পরিধেয় শতচ্ছিন্ন বস্ত্রাংশ ছিঁড়িয়া চন্দ্রকান্তের হাতে তুলিয়া দেয়। কেমন যেন স্থির হইয়া পড়িয়াছে বৃদ্ধাটি।

কাপড়ের ফালি ছিঁড়িয়া চন্দ্রকান্ত পর পর কয়টা তাগা বাঁধে। খুব কষিয়া কষিয়া।...তারপর লোকটার বিষদগ্ধ মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে আর পরম স্নেহের সহিত যেন তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে থাকে।—ঠোঁট দুটি তাহার এমনভাবে কাঁপিতেছে যেন অতীব মৃদুস্বরে কিছু বলিতেছে সুর করিয়া।—হঠাৎ খেয়াল হইল যে, এতগুলি চক্ষু তাহাকে কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছে। ও সোজা হইয়া দাঁড়ায়, বলে, "আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। তোমরা বরং হাসপাতালে নিয়ে যাও। সেখানে এলাজ হবে ঠিক।—ভয় নেই, সেরে যাবে ও।"

লোকটিকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যায় তাহারা। বৃদ্ধা যেমন ছিল, তেমনি বসিয়া থাকে। বনারসীলালেরাও রওনা দেন। কিন্তু কয় পা যাইতেই চন্দ্রকান্ত হঠাৎ ঘুরিয়া আসিয়া বলে আবার, "মায়ী, বাঁচবে ও। কোনো চিন্তা কোরো না। আমি, আমি বলছি ও বেঁচে যাবে।"

পরম বিষাদ-ভরা চক্ষু তুলিয়া বৃদ্ধা তাকায়। কী যেন দেখিতে পায় চন্দ্রকান্তের মুখে।

আস্তে উঠিয়া বলে, "জীতা রহো মেরে লাল। তুম্‌হারা ভালা হো।"

জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন তাঁহারা। চারিপার্শ্বে প্রাচীন মহীরুহেরা খাড়া হইয়া আছে নীরবে। পশ্চিম দিক ভালে-ঢালিয়া-পড়া সূর্যের ঢালা কিরণে অসমতল পত্রগুল্ম-সমাকুল ভূমির উপর দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে বনস্পতিদের। তাঁহাদের পদনিষ্পেষণে সংখ্যাহীন পর্ণের আর্তনাদ নির্গত হইতেছে। বিশাল বৃক্ষসমূহের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ুতে মর্মর জাগায়...। ওপাশের বিরাট গাছটা বিহঙ্গমের কলকাকলিতে মুখরিত। মহাব্যস্তভাবে নানা পক্ষী সেখানে আনাগোনা করিতেছে।—সবটা মিলাইয়া শান্তির এক মহাছবি। বনারসীলাল প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করিতেছেন, এই যেন ওপাশের অরণ্যপথ ধরিয়া জলগ্রাহিকা সদ্যস্নাতা কোনো আশ্রমকন্যা কক্ষে বিচিত্রিত কলস লইয়া আসিয়া পড়িবে। অথবা ওই ওখানটায় যেখানে অর্কিড লতায় ছাইয়া রাখিয়াছে নিভৃত কোণটি, সেখান হইতে যেন কোনো বনদেবী হাতছানি দিয়া ডাকিবেন...

কিন্তু বনদেবী-আশ্রমকন্যারা সুদূরপরাহত, বহু মারাত্মক সর্প এবং হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল এটি, কাজেই সাবধান হইয়া না চলিলে বিপদ। জোর পায়ে তাঁহারা হাঁটিয়া চলেন।

একটা বাঁক। অস্ফুট একটা সাংগীতিক ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে। ব্যস্তভাবে কোথায় যেন অনেক কাজ চলিতেছে। তাঁহার মনে হয়, এ-বাঁকের অপরদিকে হয়তো কোনো ঋষির আশ্রম। ঘুরিলেই চোখে পড়িবে।

পড়িল চোখে। সে যে কী দৃশ্য!—জঙ্গলটা পাতলা হইয়া গিয়াছে হঠাৎ। এক পার্শ্বে বেশ খানিকটা দূরে একটা উচু ডাঙা আচমকা ধসিয়া গিয়াছে। বহু প্রাচীন যুগের একটি ভূমিচ্যুতির নিদর্শন। তাহার উপর দিয়া গলা রুপোর মতো নির্মল জলধারা নামিয়া আসিতেছে। জলের পর্দার ওধারে দেখা যায়, ভূমির বিভিন্ন স্তর। তাহার মধ্যে একটি স্তর ঘনকৃষ্ণ, কয়লা। এইখানেই বহু বর্ষ আগে পরিশ্রান্ত এক ভাগ্যান্বেষী ধরিত্রীর জঠরমধ্যবর্তী ধনভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিলেন সহসা। অবসন্ন হতাশ তাঁহার চোখ এবং মনকে তৃপ্তি দিবার মতো প্রচুর পদার্থের সমাবেশ এখানে বর্তমান ছিল।

জলপ্রপাতের মূলদেশের বাতাসে জলরেণু উড়িতেছে। সেখান হইতে ধারাটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া, মাঝে বহু পাথরের দ্বীপ রাখিয়া, প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত। স্বচ্ছ বারিরাশি একেবারে নীচ পর্যন্ত দেখা যায়। খালি মাঝে মাঝে প্রস্তরের আঘাতে ফেনাইয়া উঠিতেছে।...এধারটা আসিয়া স্যান্ডস্টোনের একটা প্রকাণ্ড শিলার বিছানার উপর দিয়া বাহিয়া যাইতেছে।— বহুদিনের প্রবাহিত স্রোত নরম বালুকাশিলাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে, তাই টানা টানা সব অদ্ভুত নকশা কাটিয়া একটা ছোটো ক্যানিয়নের মতো সৃষ্টি হইয়াছে এখানে। সেই গভীরতার মধ্য দিয়া স্রোতস্বতীর যাত্রা। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বনারসীলাল দেখেন নাই, কোলারাডো নদীর নিম্নগ সঞ্চারও না, কিন্তু তাহারই খানিকটা যেন এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাঁহারা আসিয়া একেবারে ধারটিতে বসিলেন।—চন্দ্রকান্তর অনুরোধে বিনা তম্বুরাতে শুধু গলায় বনারসীলাল গান ধরিলেন। পূরিয়া। স্তিমিত চোখে তিনি গাহিয়া চলিয়াছেন, অচঞ্চল বসিয়া চন্দ্রকান্ত।—কখন এক সময় গান শেষ হইল। নিস্তব্ধ পরিবেশ।...

...ঝারসি পর্বতমালার ওপারে সূর্য অস্ত গেল। মৃদু চন্দ্রালোকের মাঝখানে যখন অব্যক্ত একটা জীবনীরস অতি গোপনে সঞ্চারিত হইতেছিল পর্বতে-কন্দরে-বনপ্রদেশে, তখন বনারসীলাল নড়িয়া-চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিলেন।

গলা পরিষ্কার করিয়া চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করে, "আসবার পথে আমার টাকা জমানোর কারণ জিজ্ঞাসা করছিলেন, না?"

বনারসীলাল জলের দিকে তাকাইয়া থাকিয়াই মাথা নাড়েন। অকস্মাৎ তাঁহার অতি নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বলে আগ্রহান্বিত গলায়, "আচ্ছা, আপনারা তো অনেক পড়েছেন, অনেক জানেন। বলুন তো মরা মানুষকে বাঁচানো যায় কি না।"

বনারসীলাল অবাক।—"এ কথা বলছেন কেন?"

"না, এমনি।" চন্দ্রকান্ত চুপ করে। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলে, "নাঃ, বলেই ফেলি আপনাকে।—আমি মরা মানুষ বাঁচানোর উপায় জানি। ওরকম করে তাকাবেন না।—সেকেন্দ্রাবাদে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার চোখের সামনে একটা মরা লোককে সে বাঁচিয়ে তোলে। বিশ্বাস করতে পারতাম না যদি নিজের চোখে না দেখতাম।...পাওয়ার স্টেশনের সামনে ঝড়ে-ছেঁড়া কয়েল ছুঁয়ে লোকটা মারা যায়। অন্তত সেইরকম লক্ষণই দেখা দিয়েছিল তার দেহে। হঠাৎ এই সাধুটা কোথা থেকে এসে আর ঝোলা ঝেড়ে কীসব বের করে মুখে ঢেলে দেয় আর গায়ে মালিশ করতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। আর সর্বক্ষণ ধরে অদ্ভুত সুরে খুব নিচু গলায় গাইতে থাকে। কথাগুলো ধরার চেষ্টা করেছিলাম, ধরতে পারিনি। খানিক পরেই আঘাত-খাওয়া লোকটার জ্ঞান হল।"

ও চুপ করিয়া পকেট হইতে একটা টুকরা কাগজ বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে।

বনরাসীলাল উৎসুক গলায় বলেন, "তার পর?"

"জ্ঞান হতেই সাধুটা ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেল। আমি কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়িনি। পেছন পেছন গিয়ে শহরের শেষে এক গাছতলায় তাকে পাকড়াও করে প্রশ্ন করতে থাকি। সাধুটা খালি হাসে। আমার কেমন রোখ চেপে যায়। অনেক পেড়াপিড়ির পর সে বলে, আমাকে তার শিষ্য হতে হবে। তবেই তার ওষুধের সন্ধান সে আমায় দেবে।

"কনস্ট্রাকশন কোম্পানির চাকরি ছেড়ে তার পেছনে ঘোরা আরম্ভ করি। সারা দেশটা ধরে তার সঙ্গে ঘুরেছি। তারপর সে কী মনে করে বিলাসপুরের পথের ধারে একরাতে একটা চিরকুটে সব ওষুধের নাম লিখে দেয়। অনেকগুলো ওষুধ। অনুপাত লেখা আছে তাতে।—একটা বিচিত্র সুরে তার সঙ্গে গান করতে হবে। সুরটা অনেকটা মেলে আহির ভৈঁরোর সঙ্গে।—ও হ্যাঁ, মার্গসংগীতের শিক্ষা আমার তার কাছেই। সংগীতে সে সত্যিই ছিল অতুলনীয়। আর কী দরদ দিয়েই যে গাইত।

"ওষুধটা ব্যবহার করার আগে তার লেখা অনুপাত অনুসারে মিশোতে হবে। তারপর ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে হবে সেই সুরে এই কথাগুলো—ওঁ ইতি ব্রহ্ম, ইতি ব্রহ্ম, ইতি ব্রহ্ম।

"সে রাতেই আমায় বিদায় দেয় সে।—আচ্ছা, ওদেশি বিজ্ঞান কী বলে? মরা মানুষ বাঁচে?"

বনারসীলাল মহা ফাঁপরে পড়িয়া যান।—"হুঁ—। আমেরিকার খুনেদের ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মারা হয়। তা, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন, মরার পরও পাঁচ-সাত মিনিট শরীরের টিসুগুলো সজীব থাকে। তখন যদি আবার শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ানো যায়, তবে আবার বাঁচানো যায়। অবশ্য কোনো একটা কাগজে-পড়া থেকে বলছি আমি।"

চন্দ্রকান্ত সাগ্রহে বলে, "স্বীকার করছে তা হলে। কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিট মোটে। না, তার চেয়ে অনেক বেশি সময়ের জন্যে বাঁচানো যায় তা ছাড়া—"

বনারসীলাল নিশ্চল। আর চন্দ্রকান্ত আনন্দে আত্মহারা।—"বুঝলেন, আজ মাতাদীনকে তাগা বাঁধতে গিয়ে সেই সুরটা করছিলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমি একে তো বাঁচাতে পারি! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, বিষের ক্রিয়া আমার গানে কমে আসছে। কিন্তু ওষুধগুলো নেই যে। সন্ন্যাসী যাবার পর দেখলাম পয়সার দরকার। ওষুধগুলোর একটা হচ্ছে খাঁটি শিলাজিৎ। দোকানের নয়, হিমালয়ের নির্জন পাথরে যা হয়, তাই। আর একরকমের পুষ্পের গুল্মের পাতা থেকে তেল করতে হবে, তা আবার পাওয়া যায় শুধু মানস-সরোবরের ওধারে একটা উপত্যকায়, খুব দুষ্প্রাপ্য। আরও অনেক কিছু। তা, এসব করা মানে বহু টাকার ব্যাপার। কতদিন থাকতে হবে পাহাড়ে-জঙ্গলে। তাই খুঁজে পেতে এ-চাকরিটা নিলাম। টাকা জমাচ্ছি, যথেষ্ট হলেই বেরোব। আপনি কী বলেন, শ-পাঁচেক টাকায় হবে?"

বনারসীলাল উহার কথা শুনিতে শুনিতে যেন উহারই মতো উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

"আরে দূর। ওতে কী হবে? অন্তত একটা বছরের মতো পাথেয় নিয়ে রওনা হবেন। কতদিন যাবে, বলা তো যায় না।—কিছু না হোক, হাজার পাঁচ-ছয় টাকা তো লাগবেই।"

হতাশ হইয়া পড়ে ও।—"পাঁচ হাজার? জীবনে রোজগার করতে পারব না।...বলুন তো দেখি, কেমন লাগে? মৃতসঞ্জীবনী আমার মুঠোর ভেতর। একেবারে মুঠোর মধ্যে। অথচ আনবার উপায় নেই। একবার আনতে পারলে কী হত?—সবাইকে বিলিয়ে দিতাম। সবাইকে। মানুষ, মানুষ উদ্ধার হয়ে যেত—"

উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুর্দম আবেগ আর সামলাইতে পারিতেছে না। উত্তেজনায় অস্বাভাবিক চোখ দুইটা রীতিমতো ভয়ংকর হইয়া পড়িয়াছে।

যেমন অতর্কিতে আবেগটি আসিয়াছিল, তেমনি আচম্বিতে সশব্দে হাসিয়া উঠে। প্রাণখোলা উচ্চকিত হাসি। যেন পথ বাহির করিয়াছে সে একটা।

হাতের তালপাকানো কাগজের টুকরাটা খরস্রোতা পার্বত্য নদীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।—"চলুন যাই।"

বনারসীলাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়েন। তাহার সহিত তাল মিলাইয়া চলা তাঁহার পক্ষে বেশ কষ্টকর বোধ হইতেছিল সে-রাত্রে। অসম্ভব দ্রুতবেগে হাঁটিতেছে সে।

বাড়ি অবধি আগাইয়া দিয়া গেল চন্দ্রকান্ত।

পরদিন সকালে চা খাইতে খাইতে বনারসীলাল ভাবিতেছিলেন গত সন্ধ্যার কথা। তখন ওই পরিবেষ্টনীতে তাহার কথাগুলোতে হাস্যকর বা অবিশ্বাসজনক কিছু বোধ হয় নাই। সাপে-কাটা মাতাদীনের ঘটনার পর অমন একটা জায়গায় গিয়া পড়িয়া এসব কথা যেন দৈনন্দিন সাধারণ গল্পগাছার মতোই স্বাভাবিক লাগিতেছিল। কিন্তু পরিষ্কার দিনের আলোয় বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারবাবুর সঙ্গে বসিয়া চা খাইতে খাইতে এখন মনে হয়, পাগল-ছাগল পাইয়া কেহ ভুজং দিয়া ঠকাইয়া গিয়াছে বেচারাকে। তাহার কষ্টসঞ্চিত অর্থ এভাবে অসম্ভব ছেলেমানুষির পিছনে খরচ করার কোনো মানে হয় না। তাঁহার চেষ্টা করা উচিত যাহাতে সে এসব ধারণা ছাড়ে।

চিরকুটটা একবার দেখিতে হইবে, কী আজেবাজে লিখিয়া গিয়াছে সাধুটা।

একটা শোরগোল ওঠে ফটকের দিক হইতে। উত্তেজিত অনেক কটি গলা শোনা যায়। ইঞ্জিনিয়ারবাবু বাহিরে যান।

জানালা দিয়া দেখিতে পান বনারসীলাল, তিনি যেন খুব ব্যস্তভাবে কী শুনিতেছেন, আর একটা দারোয়ানগোছের লোক হাত-পা নাড়িয়া কোনো একটা কথা বুঝাইতেছে।—আবার ঘরে আসেন ইঞ্জিনিয়ারবাবু। কোট আর হ্যাট পড়িয়া লন। তাহার পর তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলেন, "শুনেছেন ওস্তাদজি, আপনার ফেভারিট সেই চন্দ্রকান্তর কাণ্ড?"

"কী?"

"কাল রাত প্রায় দশটায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারসাহেব গাড়ি করে মানেন্দ্রগড় থেকে প্রায় হাজার পনেরো টাকা নিয়ে আসছিলেন, আজ কুলিদের হপ্তা দেবার দিন। প্রতি শুক্রবারই তিনি ওই পরিমাণ টাকা নিয়ে আসেন। পথে স্কাউন্ড্রেলটা একটা মোড়ের কাছে নিচু এক গাছের ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে কাবু করে ফেলে। গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছে। ভদ্রলোক বন্দুক নিয়েছিলেন সঙ্গে, কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। কতদিন বলেছি, মশায় একটা সেন্ট্রি নিয়ে যান, শুনবেন না। এখন বুঝুন ঠেলা। মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, বেলা প্রায় ছয়টার সময় তাঁকে আবিষ্কার করা হয়।—পনেরো হাজার টাকা! চাট্টিখানি কথা! যাই, পুলিশে এত্তেলা দিইগে। আশা অবশ্য নেই, নাইট এক্সপ্রেস ধরে এতক্ষণ কাট্‌নি ছাড়িয়ে গেছে মনে হয়। তা ছাড়া যা চালাক, ধরা মুশকিল হবে।—কী সাংঘাতিক!"

ইঞ্জিনিয়ারবাবু হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইয়া যান।

সেদিনটা কাটিল হইচই-এর মধ্যে। চন্দ্রকান্তর কোনো পাত্তা মেলে নাই।

সেই রাত্রেই বনারসীলাল বিদায় লইয়া চলিয়া আসেন। তাঁহার কেমন ওখানে থাকিতে ভালো লাগে নাই।

...সে আজ কত বছরের কথা হইল। ইহার মধ্যে সে-জায়গার লোকদের সংবাদ আর পান নাই তিনি। মাঝে মাঝে মনে হইত, কোথায় আছে, কেমন আছে সেই চন্দ্রকান্ত?

হয়তো মারা গিয়াছে কোথায় কোন উত্তুঙ্গ নির্জনতার মধ্যে, কিংবা হয়তো আজও

খুঁজিয়া ফিরিতেছে হিমালয়ের হিমশীতল দুর্নিরীক্ষ্য দুর্গম নিভৃত সরোবর-তীরে।...শেষেরটিই সত্য হউক, মনে মনে ভাবিতেন তিনি। পাগলটা ফিরিবে একদিন তাহার মৃতসঞ্জীবনী সঙ্গে লইয়া, ভাবিতেও ভালো লাগিত।

কথাগুলা আজ এতকাল পরে মনে হইবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সেই ইঞ্জিনিয়ারবাবুটির সহিত পথে দেখা। বনারসীলাল চিনিতে পারেন নাই। তিনিই ডাক দিলেন।

একথা-সেকথার পর ভদ্রলোক চন্দ্রকান্তর কথা পাড়েন। বনারসীলাল উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিলেন, কিছু কহেন নাই।

...চন্দ্রকান্ত তাহার পরদিনই ধরা পড়ে। নিকটবর্তী খোঙ্গাপানি জলপ্রপাতের নিকট বমালসমেত ঘোরাফেরা করিতেছিল, আর বিড়বিড় করিয়া বলিতেছিল—"খালি খুঁজছি কাগজটা, পাচ্ছি না। কোথায় গেল? এখানে ফেলে গিয়েছিলাম না? অনুপাত লেখা আছে, ওটা না হলে যে চলবে না।"—চোখ ঘোর লাল, চুল অবিন্যস্ত অবস্থায়, জামাকাপড় ছেঁড়া।

ঘোর উন্মাদ। একটা কথাও সুসংলগ্ন বলে না।

দেশ বর্ষ ১৫ সংখ্যা-৪৫ ২৬ ভাদ্র ১৩৫৫ পৃষ্ঠা-২৬১-২৬৬

ভূস্বর্গ অচঞ্চল

চরম শীত পড়েছে আজ।

আশ্চর্য। এই কথাটাই বারে বারে মনে হচ্ছে মকবুল শেরওয়ানির। বড়মুলার সরু প্রধান রাস্তাটা, পাশের কাঠের দোতলার বিবর্ণ সাইনবোর্ডগুলো, রাস্তা-বোঝাই উল্লসিত হানাদারের দল— এসব পেরিয়ে দূরের দুর্নিরীক্ষ্য তুষারাবৃত পর্বতশিখরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন যেন।

বড়মুলার রাস্তায় বরফ পড়েছে গতরাতে। কলার ওলটানো মোটা ওভারকোট-পরা আফ্রিদি আর মোমেনদের ভারী বুটের তলায় সে-বরফ মলিন, কাদা-মাখা। পাহাড়ের দিক থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে আনেন শেরওয়ানি। হানাদারগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা, জায়গায় জায়গায় তুষারদষ্ট মুখওয়ালা পাখ্‌তুনগুলো কথা বলছে, মুখ দিয়ে তাদের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দেখে কেমন মায়া লাগে তাঁর। ওরা যেন মানুষ নয়, বিবর্তনের প্রথম আমলের বাসিন্দে। জাভাম্যান বা প্যালিওলিথিকদের সমগোত্রীয়।...ওপাশটাতে রাইফেল কাঁধে ফেলে কয়েকটা হানাদার সিগারেট টানছে। একদিকে একটা গোলায়-ধসা বাড়ির একটা দেওয়ালসমেত ভিতটা দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো বড়ো-ছোটো কাঠ পড়ে আছে এখানে-ওখানে। কতকগুলো ক্ষুধার্ত কাশ্মীরি ছেঁড়া সালোয়ার আর মোটা কম্বল গায়ে এসে দাঁড়িয়েছে একধারে কুকুরের মতো জড়ো হয়ে।

লুঠ-হওয়া মেওয়ার দোকানের সিঁড়ির ওপর হাতে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় বসে এ সমস্তই লক্ষ করছিলেন মকবুল শেরওয়ানি।

তাঁর পাশে বসে আহমদজান। লোকটা ডাল হ্রদে মাছ ধরে দিন কাটাত। চারিদিকে-পাহাড়-ওঠা শান্ত নিস্তরঙ্গ ডাল হ্রদে ভোরের কুয়াশার অস্পষ্টতার মধ্যে আহমদজান বর্শা দিয়ে মাছ গাঁথত। ন্যাশনাল কনফারেন্সের আহ্বানে উপত্যকার শেষে এসে পড়েছে। রোগা ছোটো মানুষ, কিছু ভিতু, কিছুটা লাজুক। লড়াই-এর একেবারে কিছু বোঝে না। গেরিলাদের ঘাঁটিতে বসে থাকাই তার একমাত্র কাজ ছিল। কাল শেষরাতে যখন হঠাৎ হানাদারেরা এসে পড়ে সামনের টিলার ওপর দিয়ে, তিনি আর এই আহমদজানই ধরা পড়ে যান। লোকটা দু-হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে তাতে মাথা রেখে মৃদু কাঁপছিল। পুরু নোংরা কম্বলে শীত বুঝি মানে না।

কাল শেষ রাতে। মেয়েদের ধর্ষণের কাহিনী অনেক শুনেছেন, অনেক অত্যাচারিতা নারীকে দেখেছেন শেরওয়ানি। কিন্তু ভোর রাতে আসার পথের ঘটনাটা শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েটিকে বড়মুলার মাইলখানেক ওপরে তাঁরা দেখতে পান। রাস্তার ধারের একটা নয়নজুলির মধ্যে পড়েছিল সে। সমতালে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে আসার চেষ্টা করছিল মেয়েটি। সে ছিল সন্তানসম্ভবা। ছেঁড়া

সালোয়ার আর জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, রক্তমাখা দোপাট্টা মাটিতে লুটোচ্ছিল। ওই শীতে প্রায় অনাবৃত পড়েছিল কতক্ষণ, কে জানে। ঠোঁট দুটো তার শীতে নীল হয়ে গিয়েছিল...। কী বীভৎস দৃশ্য! রাস্তার ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছিল, নড়বার শক্তি তার আর ছিল না, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। এদের দেখে তার সে কী ভয়-ব্যাকুলতা! কয়েকটা 'আজাদ কাশ্মীর' বাহিনীর সেনানী মেয়েটাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতে থাকে, একজন একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে জঘন্য একটা কথা বলে, সবাই হেসে ওঠে। ওঁরা চলে আসার খানিক পরেই মেয়েটা নিশ্চয় মরে গিয়েছে।

আজাদ-কাশ্মীর। এরাই বটে। এর মধ্যে উপজাতি আছে, আমেরিকান-ব্রিটিশ সায়েব আছে, পাকিস্তান ফৌজের সৈন্যরাও আছে। নেই কেবল কাশ্মীরি। মুসলিম কনফারেন্সের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এদেশের খুব কম লোকই ও-দলে যোগ দিয়েছে। আর এরা কাশ্মীরকে আজাদ করছে এইভাবে, এই মা-বোনদের ধর্ষণ করে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, অসহায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। মুসলমান এরা নয়, আজকের মেয়েটার মতো বেশির ভাগ ধর্ষিতাই মুসলমান, বিতাড়িত লুণ্ঠিত অসহায়রাও মুসলমান। এরা মানুষই নয় ; পশু, পিশাচ সব। অর্থ, আর নারীদেহ, এ ছাড়া আর কিছু এদের মনে সাড়া জাগাতে পারে না।— গভীর ঘৃণা আর অনুকম্পা হয় শেরওয়ানির।

অক্টোবর মাস। শীতের সুবিধেটা এরা পুরো গ্রহণ করেছে। সামনের মাস কটা এরকমই যাবে। তারপর কাশ্মীর দেখবে। শের-ই-কাশ্মীর দেখবেন।— প্রতিশোধের সেই পরম দিনে বেঁচে যে থাকবেন না তিনি, তা শেরওয়ানি জানেন। একবার ধরেছে, উৎপাতকারীদের নেতা মকবুল শেরওয়ানিকে ওরা আর ছাড়ছে না। তাতে আর কী হয়েছে! এই তো স্বাভাবিক। তাঁর খালি মায়া হচ্ছে আহমদজানের জন্য। বেচারা ডালহ্রদ তীরের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এসেছিল বটে, কিন্তু ও এ-কাজের উপযুক্তই নয়। কেমন যেন নেতিয়ে-পড়া লোক। গেরিলাদের জন্য যে-ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন, তার কিছুই ছিল না লোকটার মধ্যে। ওর দিকে তাকান তিনি। কেমন আচ্ছন্নের মতো মুখ গুঁজে বসে কাঁপছে।—কাঁদছে নাকি?

তা পারে। মকবুল শেরওয়ানি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। লোকটা মরবেই। মিছিমিছি খানিকটা হাতে-পায়ে ধরাধরি করে বুটের বাড়ি খাবে। হাঁটু দিয়ে ধাক্কা মারেন তিনি ওকে, আহমদজান মুখ তুলে তাকায়, না, কাঁদছে না। তবে চোখ দুটো কেমন চকচক করছে আর থুতনিটা থর থর করে কাঁপছে। শীতে বোধ হয়।

বলেন শেরওয়ানি, "কী আহমদজান। শীত করে নাকি?" অন্যমনস্কভাবে ও বলে, "হুঁ। আচ্ছা, কতদিনের মধ্যে সরকারি বাহিনী এখানে আসতে পারে?"

লোকটা ভয়ই পেয়েছে। তিনি বলেন—"এই তো শীতের শুরু। তা ছাড়া হানাদাররাও সবে আক্রমণ করেছে। গোটা শীতের মধ্যেও অন্য দলের না আসারই সম্ভাবনা। এখানে আসতে অন্তত পক্ষে মার্চ-এপ্রিল তো বটেই।—আমাদের কোনো আশা নেই।" যোগ করেন তিনি!

"আমি সে কথা বলছিলাম না।" আহমদজান হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে তাঁর দিকে। "শের-ই-কাশ্মীর একদিন এখানে আসবেন তো? এরা হটে যাবে তো?"

মকবুল শেরওয়ানি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—"নিশ্চয়ই। আমরা এই পশুদের হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করব। একজন সত্যিকারের কাশ্মীরি বেঁচে থাকতে লড়াই চলবে।"

আহমদজানের কৌতূহল মিটে যায়। আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। কী ভাবছে ও, অমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করে কেন?

আবার রাস্তাটার দিকে চান তিনি। হানাদারগুলো তেমনি যে যার কাজে ব্যস্ত। একটা ঠান্ডা কনকনে বাতাস আরম্ভ হল, হাড়ের ভেতর পর্যন্ত যেন কেটে দিয়ে যায়। গুটিসুটি হয়ে বসলেন তিনি।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর একটা ইউনিফর্ম-পরা ক্যাপ্টেন এসে হাজির হয়। আগে ওকে দেখেছেন তিনি, দেখে বোঝা যায় কীরকম কুটিল লোকটা। সে দুটো সেপাইকে কী যেন বলে, তারা এগিয়ে আসে। বরফের মধ্যে ওদের বুট বসে যাবার একটা অদ্ভুত আওয়াজ হতে থাকে। ওরা এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। মকবুল প্রস্তুত করেন নিজেকে। আহমদজান মুখ তুলে একটু উদ্‌ভ্রান্ত, একটু অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওদের দেখে। ওরা আহমদজানকে তুলে ধরে। ও ওদের দিকে অন্যমনস্কভাবে চায়।

লোক দুটো খাঁটি আফ্রিদি। ছ-ফুটের ওপর লম্বা বিশাল চেহারা। একটার আবার বসন্ত হয়েছিল বোধ হয়, সারামুখ দাগে ভরতি, বাঁ চোখটা নষ্ট। আরেকটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দুজনেরই মুখে নির্বোধ গর্বের ছাপ সুস্পষ্ট। যেন দুটো অসীম শক্তিশালী রোবট, মস্তিষ্ক বলে কিছু নেই।

আহমদজানকে ওরা হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। মকবুল শেরওয়ানি ঘাবড়ে গেলেন। নিশ্চয়ই ওরা ওকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ও লোকটা যেমন ভিতু আর আগের থেকেই যেমন কুঁকড়ে আছে, প্রশ্ন করামাত্র যা জানে বলে দেবে।

উনি উঠে দাঁড়ান ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। একটা সৈন্য সরে এসে রাইফেলটা তোলে। ক্যাপ্টেন ওঁকে লক্ষ করতে থাকে ; তারপরে কী ভেবে চলে আসে ওঁর কাছে। আহমদজানকে ওরা এগিয়ে নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে আহমদজানকে বলে "তা হলে এই হচ্ছে সর্দার!"

আহমদ অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকায়, কী যেন একটা কথা সেই কাল থেকে ভাবছে ও।

ক্যাপ্টেন ওর মুখের ওপর বিদ্রূপপূর্ণ চোখ বুলিয়ে যায়। তারপর আহমদকে বলে, "বেশ, তোমার নাম কী?"

—"আহমদজান।"

—"বেশ, বেশ। তা, শোনো আহমদজান। তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব। তুমি কিন্তু তোমাদের দলে কে কে ছিল এবং কোথায় আড্ডা আমায় বলে দেবে। দেখতে পাচ্ছ তো, কীভাবে অর্থ আমরা পাচ্ছি। কাজ ঠিক করলে তা-ও মোটাই মিলবে। তোমার মতো সত্যিকারের স্বদেশভক্ত কাশ্মীরিই চাই আমরা। হিন্দু রাজা আর হিন্দুস্থানি সরকারের ধোঁকায় কাশ্মীরিরা ভুলবে না।"

সশঙ্কিত চোখে মকবুল শেরওয়ানি ওকে দেখেন। আহমদজানের মুখ গভীর চিন্তামগ্ন,

এসব কথা যেন শোনেইনি সে। ক্যাপ্টেনের ধৈর্যচ্যুতি হয়।

—"শুনছ, বহু টাকার ব্যাপার, প্রাণও বেঁচে যাবে।" ক্যাপ্টেন মুখ এগিয়ে বলে—"লোকটা হাবা নাকি? শুনছ, আবদুল্লার দলের পরাজয় হবেই। বেলা থাকতে সুযোগের—"

শেখ আবদুল্লার নাম কানে যেতেই ও যেন কথা খুঁজে পায়।

"কুত্তা, শের-ই-কাশ্মীর এখানে আসবেনই।" কলের পুতুলের মতো কথাগুলো বলে। তার পর পরম নির্লিপ্তভাবে ক্যাপ্টেনের এগোনো মুখে খানিকটা থুতু ফেলে।

চমকে ক্যাপ্টেনটা মুখ সরিয়ে নেয়। সৈন্য দুটো রাইফেল উঁচোয়। নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আহমদজান। শীতে শুধু থেকে থেকে শিহরন লাগে ওর। ক্যাপ্টেন রুমাল বের করে মুখ মুছতে থাকে। ওর মুখ রাগে লাল।

আহমদজান দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যেন নতুন কথা খুঁজে বের করে—"কুত্তা!"

ক্যাপ্টেন থরথরে হাতে পিস্তল বের করে, তার পর আবার কী ভেবে ওটা খাপে রাখে। তার পর কালো সেপাইটাকে আহমদের কম্বল খুলে নিতে বলে। ওর কম্বল খুলে নেওয়া হল। তার তলে একটা সাধারণ ভেস্ট আর শার্ট। এক এক করে তাও খুলে নিল তারা। কেবল সালোয়ার পরে ওই শীতে আহমদজান দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাস বরফের চেয়েও ঠান্ডা, আহমদের রোগা দেহটা কেমন নীল লাগে শেরওয়ানির কাছে।

আহমদজান ওদের বাধা দেয়নি, বরং সাহায্যই করেছে। তার দাঁতে দাঁত ঠোকার শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। কোনোরকমে বলে "কুত্তো মুর্দাবাদ!"

ক্যাপ্টেন আর সহ্য করতে পারে না। ভারী বুটের এক আচমকা লাথিতে ওকে সেই কাদা-মাখা বরফের মধ্যে ফেলে দেয়। শেরওয়ানি শিউরে ওঠেন।

নির্বিকার মুখের ভাব ওর। কানা সেপাই কোথায় চলে যায়। আহমদজান মকবুল শেরওয়ানির দিকে তাকিয়ে বলে "কেমন, ঠিক করিনি আমি?"

মকবুল বলে ওঠেন "তুমি—"

একজন সেপাই তাঁর হাত চেপে ধরে। ধীরে তিনি হাতটা ছাড়িয়ে নেন। কানা সেপাইটা খোঁজাখুঁজি করে একটা ভাঙা দরজার এক পাল্লা নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন ইশারায় সেটা আহমদজানের বুকের ওপর রাখতে বলে।

মকবুল শেরওয়ানি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। পশু, নীচ, জঘন্য পশু এরা। তিনি ক্যাপ্টেনকে না বলে পারেন না—"নিশ্চয়ই তুমি—"

—ক্যাপ্টেন হিলের ওপর ঘুরে বিদ্রূপপূর্ণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে—"শাট্ আপ!"

মকবুল চোখ বোজেন। চারজন সেপাই পাল্লাটার ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে। আহমদজানের মুখ দিয়ে কোনো আর্তনাদ বেরোয় না। কষ্ট করে ঢোক গিলে ফের বলে—"কুত্তা।"

মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ওর চাপ চাপ রক্ত বের হতে থাকে। গাঢ় লাল তার রং।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আহমদজান মারা যায়।

সেপাইগুলো এতে উল্লসিত হয়েছে বোধ হল। একজন পা দিয়ে তক্তাটা সরিয়ে দিল।...

ক্যাপ্টেন ও সম্বন্ধে আর চিন্তা করছে না। সে ঘুরে এদিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে—"তবে তুমিই সর্দার। বেশ বেশ!"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন কাশ্মীরি তার কাছে আসে। লোকটা তাঁর চেনা, এখানকারই লোক। কানে কানে ক্যাপ্টেনকে কী যেন বলে সে। ক্যাপ্টেন ভুরু তুলে বলে—"তাই নাকি?" লোকটা কী বিশ্রী করে হাসতে থাকে। ক্যাপ্টেন বলে আবার—"তোমার কথা মনে রইল।—ও, মকবুল শেরওয়ানি সাহাব? আদাবর্স্। ন্যাশনাল কনফারেন্সের বড়ো লিডার, আদাবর্স্।" একটা সিগারেট ধরিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সেলাম করে।

"কায়েদ-ই-আজম যখন বড়মুলায় আসেন বিশ্রাম করতে, তখন তুমিই তাঁর সভায় গোল প্যাকিয়েছিলে!"

মকবুল শেরওয়ানি খুব মিষ্টি করে হাসেন—"না, মিঃ জিন্না যখন এসেছিলেন, তাঁর সভামঞ্চে উঠে তখন দুটো কথা বলেছিলাম মাত্র। শ্রীনগরে শেখসাহেবের সামনে তিনি বলেছিলেন, আমাদের রাজনীতিতে তিনি মাথা ঘামাবেন না। তারপরই কিন্তু মুসলিম কনফারেন্সের হয়ে নানাকথা বলেন অন্য সভায়। এখানেও সেই ব্যাপারই করতে যাচ্ছিলেন, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছিলেন, তাই আর কী তাঁর সভায় উঠে দুটো কথা বলেছিলাম। ফলে ভয় পেয়ে তিনি এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যান। ডোগ্‌রা সৈন্যদের সাহায্যও নিয়েছিলেন। তা, এখানকার দুষ্টু লোকেরা বলে থাকে— বড়মুলাই ভারতে একমাত্র স্থান, যেখান থেকে জিন্নাকে প্রাণ হাতে করে পালাতে হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন আস্তে আস্তে লাল হয়ে ওঠে। তারপর ছোট্ট একটা "হুঁ" বলে দ্রুতপদে চলে যায়।

মকবুল শেরওয়ানির মনে হচ্ছিল ওই আহমদজানের কথা। লোকটা এত মিনমিনে স্বভাবের ছিল! কথা বলতে পর্যন্ত পারত না ভালো করে। এখানে এসে অবধি ডাল হ্রদের ধারে ফিরে যাবার ইচ্ছে তার কীরকম প্রবল ছিল, তা তাঁর জানা আছে।

হঠাৎ লোকটা এত জোর পেল কোথা থেকে?

ক্যাপ্টেন তখন রাস্তার ধারের পড়ে-থাকা কাঠগুলোকে পা দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে কী যেন বলছিল, আর মাঝে মাঝে গোলায়-ভাঙা বাড়িটা নির্দেশ করছিল। লোকটা তারপর চলে গেল কোথায়।

মকবুল শেরওয়ানি বসে পড়েন আবার।

খানিকক্ষণ কেটে যায়। তাঁর চোখের সামনে সৈন্যরা ভিতটা পরিষ্কার করে ফেলল। কয়েকজন মিলে দুটো ছোটো-বড়ো কাঠ আড়াআড়ি বেঁধে একটা ক্রুশ তৈরি করে। ভিতে সেটা পোঁতা হল।

ক্যাপ্টেনটা খেয়ে এল বোধ হয়। মুখ মুছতে মুছতে এল।— মকবুল শেরওয়ানিকে

ওই ভাঙা বাড়িটার দিকে নিয়ে যাওয়া হল। যেতে যেতে তিনি আহমদের দেহটার পাশে থমকে দাঁড়ালেন। সেপাই দুটো কিছু বলে না। তিনি তাকালেন শীর্ণ, ছিন্ন মুখটির দিকে। মুখের পাশ দিয়ে রক্তের চাপ নেমে গেছে, নাকের দুই ফুটো দিয়ে রক্তের ধারা।—"সেলাম আহমদজান। শের-ই-কাশ্মীরের পার্শ্বচর মকবুল শেরওয়ানি তোমায় সেলাম জানাচ্ছে, শেখ আবদুল্লা তোমায় সেলাম জানাচ্ছেন, সারা কাশ্মীর তোমায় সেলাম জানাচ্ছে। একদিন তামাম হিন্দুস্থান তোমায় সেলাম জানাবে। এখনও তুমি পড়ে আছ এই অক্টোবরের সকালে, এই বড়মুলার সদর রাস্তায়, এই হানাদারদের সামনে—একটা নির্বিকার নীরব ধীর প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি।— খোদা হাফিজ।"

উপত্যকার উপান্তে পাহাড়ের বরফের চূড়োটা দাঁড়িয়ে, কুয়াশায় তার কোল ঢাকা, সবের প্রান্তরেখা অস্পষ্ট, কী একটা রহস্য জড়িয়ে আছে। ঠান্ডা কনকনে বাতাসটা এখন রীতিমতো ছোটোখাটো ঝড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তার আনাচকানাচ থেকে বরফের গুঁড়ো উড়ে আসে। একটু দূরের জিনিসও ঝাপসা। সূর্যদেব একবার দেখা দেবার পর কুয়াশার পাতলা মেঘের আড়ালে চলে গেছেন, কেমন একটা চাপা জ্যোতি চারিপাশে...

মকবুল শেরওয়ানি এগিয়ে চলেন।

তারপর আরম্ভ হল দু-হাজার বছর আগের ইতিহাসের পুনরাভিনয়। ভাবে নয়, কাজে। সত্যি সত্যিই সেই ধসা-ভিতের ওপর ক্রুশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধা হল। তার পর কানা সৈন্যটা বড়ো বড়ো লোহার গজাল আর একটা বড়ো হাতুড়ি নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেনটা হাসিমুখে তাঁকে দেখছে। কাশ্মীরিগুলো একপাল কুকুরের মতো একটু একটু করে সরে এল। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতার পরীক্ষা হল শুরু।

ক্যাপ্টেনটা এগিয়ে এসে বলল, "দেখো শেরওয়ানি। তুমি নিশ্চয় ও লোকটার মতো বোকা নও। নিজের কীসে ভালো-মন্দ, তা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ। তোমাকে আমার মারবার ইচ্ছে নেই, সত্যি, মারতে আমার কষ্ট হবে রীতিমতো। বীরের কদর বীরে বোঝে। শোনো, এইসব কারণেই, যদি তুমি অন্তত শত্রুতা না কর, তোমায় আমি মারব না, সঙ্গে করে রেখে দেব। তোমার কোনো কষ্ট হবে না। আরও কত ন্যাশনাল কর্মী আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। তোমাকে চাই কী ভালো সিভিলিয়ান কাজও দেওয়া যেতে পারে।— আর কথা না শুনলে, দেখতেই পাচ্ছ কী ধরনের পরিণতি অপেক্ষা করছে। অবশ্য আমার বিশ্বাস, তুমি আমার কথা বুঝবে।"

শেরওয়ানি চুপ করে থাকেন। ওদের দলে যোগদানকারীদের উনি জানেন। ভীত, লালায়িত কতকগুলো লোক। এ-প্রস্তাব করার কারণও বুঝতে পারেন তিনি। কাগজে কাগজে জগতের কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। ওঁর সম্মতিলাভ একটা স্বত্ব অধিকার করার চাইতেও মূল্যবান।

ক্যাপ্টেন বলে— "তা হলে বলো, আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ!" একসঙ্গে সৈন্যগুলো চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটার মুখে থুতু দেবেন নাকি? নাঃ, সেটা বড়ো নোংরা হয়ে যাবে। আবার ও বলে—"কী চুপ করে আছ কেন?"

"এই বলি। আজাদ কাশ্মীর মুর্দাবাদ।" ধীরে ধীরে, প্রত্যেক কথায় জোর দিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে শেরওয়ানি।

ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো ছোটো হয়ে আসে। হঠাৎ ও হেসে ওঠে—"বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করছ? বেশ, বেশ— এই লাগাও!"

বাঁ হাতখানা আড়াআড়ি তক্তার সঙ্গে ধরা হয়। কানাটা গজালটা লাগিয়ে ঠুকতে যায়। শেরওয়ানি ঠোঁট চেপে চোখ বোজেন। আবার ক্যাপ্টেনের হাসি—"হা, হা, বীরত্ব ছুটে যাচ্ছে ক্রমে।"

নাঃ, দুর্বলতা সেখানে চলবে না।— "জানোয়ার, হাজার অত্যাচারেও কাশ্মীর টলবে না। ভেবেছ, ঢুকলাম আর সারা দেশটা বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেল? শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ, কাশ্মীর সরকার জিন্দাবাদ।"

ক্যাপ্টেনের ধৈর্যচ্যুতি হয়। মাটিতে পা ঠুকে বলে— "দেরি কোরো না। আরম্ভ করো।"

আধুনিক ইতিহাসের এক নতুন উজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু। গজালের তীক্ষ্ণ মুখটা হাতুড়ির এক আঘাতে নরম মাংস ভেদ করে ঢুকে যায় কাঠে। রক্ত গড়াতে থাকে। শেরওয়ানির মনে হচ্ছে যেন আগুন ছুটছে এক এক আঘাতে। ঝলকে ঝলকে তীব্র ব্যথা হাত থেকে কাঁধে, কাঁধ থেকে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে।

দাঁত দিয়ে উনি ঠোঁট চেপে থাকেন। ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করে—"কী, বলবে আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ?"

উত্তর না পেয়ে ওর রোখ ক্রমেই চড়তে থাকে "ওই হাতে লাগাও।" ডান হাতটা এবার, উঃ কী যন্ত্রণা। আর পারা যায় না। কিন্তু—

"কাশ্মীর সরকার জিন্দাবাদ।" চিৎকার করে ওঠেন শেরওয়ানি। ক্যাপ্টেন এবার খেপে যায়। এলোপাথাড়ি ঘুসি মেরে যায় ওঁর চোখেমুখে। গালটা অনেকখানি কেটে যায়। রক্ত পড়ছে মুখের ওপর, কেমন নোনতা তার স্বাদ।

কাশ্মীরি জনতা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যায়। তারাও এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না।

মাথাটা ঘুরছে, কপালের বাঁ দিকটা ফুলে গেছে শেরওয়ানির। লাল টকটকে চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

"শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ।"

কথাগুলো যেন হাতুড়ির আঘাতের মতোই লাগে গিয়ে ক্যাপ্টেনের গায়ে। সে পাগলের মতো চ্যাঁচাতে থাকে—"লাগাও, অপেক্ষা কোরো না।"

কানা সেপাইটা ইতস্তত করে। রোবটেরও হৃদয় আছে কি? বলে—"ও যে মরে যাচ্ছে।"

"আমিও তো তাই চাই। এরকম যন্ত্রণাই দিতে চাই।"

আবার একচোট ঘুসি বর্ষিত হয়।... মাথাটা আর যন্ত্রণা অনুভব করছে না। স্নায়ুগুলো

অসাড় হয়ে গেছে। শুধু অসীম ইচ্ছাশক্তির বলেই তিনি ওর দিকে তাকিয়ে বলেন—

"আজাদ কাশ্মীর দল মুর্দাবাদ।"

একটার পর একটা গজাল তার দেহে ঢুকতে থাকে।...পর্বত-চূড়াটা কী জ্যোতির্ময়ই না লাগছে। উপত্যকাটা কী সুন্দর! আকাশটা ধোঁয়াটে হয়ে মিলিয়ে গেছে। অপরূপ! ভূস্বর্গ কাশ্মীর!

ওই চেনার গাছটা বরফে ঢাকা। বিমলিন শ্বেত বরফগুলো কত অদ্ভুত নকশাই না তৈরি করছে ওখানে, বাড়ির কার্নিশে, টিনের চালে। ও-গাছটা একদিন সবুজ হয়ে উঠবে; সবুজ পাতায় ভরে যাবে ; উপত্যকার আঙুরের বাগান ভরতি রস-ভরা আঙুর হবে; কাশ্মীরি গালচের মতো নরম ঘাসের আস্তরণে উপত্যকাটা ভরে যাবে। বসন্ত আসবে।

বসন্তের সঙ্গে আসবে সৈন্যবাহিনী। দলে দলে, কাতার দিয়ে লোক, পাহাড় পেরিয়ে, গিরিসংকট অতিক্রম করে, নদীতে সাঁকো বেঁধে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ করে আসবে। তাদের পুরোভাগে ছয় ফুটের ওপর লম্বা বিরাট পুরুষ সুদৃঢ় লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে আসবেন। কাশ্মীরের বাঘ। তাঁর সামনে কুকুরগুলো ভেসে যাবে। নতুন পত্তনি হবে, নতুন করে কাশ্মীর গড়ে উঠবে, তাঁর স্বপ্নের কাশ্মীর। ডোগ্‌রা রাজার পায়ের তলায় পড়ে-থাকা কাশ্মীর নয়, জনগণের ভূস্বর্গ কাশ্মীর। ভূ-স্বর্গ।... মাথাটা তাঁর কেমন একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গি করে নেতিয়ে পড়ে।...

ক্যাপ্টেনটা বলে—"মরে গেছে। নামিয়ে ফেলো!"

বহুদূরাগত শব্দটা কানে আসতে জড়তা কাটিয়ে উঠে আবার বলেন—" শেখ আবদুল্লা জিন্দাবাদ, কাশ্মীর জিন্দাবাদ।"

ক্যাপ্টেনটা হাঁপিয়ে গেছে। হতাশভাবে ভাঙা সিঁড়িগুলো দিয়ে নেমে যায়। প্রতীক্ষারত সৈনিকদের হুকুম দিয়ে সে দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধরায়। কয়েকটি সৈন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে। একটা হাবিলদার তাদের পাশে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছে।

এ সবই আবছা আবছা দেখতে পান মকবুল শেরওয়ানি। পৃথিবী ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে তাঁর মরণোন্মুখ দৃষ্টিশক্তিতে। আজ এই পরমক্ষণে একমুহূর্তে তাঁর সমস্ত জীবনটা ছায়াছবির মতো তাঁর মনে প্রতিফলিত হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিনি তাঁর সমগ্র অতীতটা দেখতে পান। দেখেন, তাতে দুঃখ করবার মতো কিছু নেই। সামনের ওই উত্তুঙ্গ দুর্নিরীক্ষ্য পর্বত চূড়াটার মতোই তাঁর জীবন শুভ্র, উদগ্র, অনুশোচনার কিছু নেই তাতে।

একটা প্রকাণ্ড কারণের জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন তিনি ; আর আজ তারই জন্য বিশাল মৃত্যুর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

সবচেয়ে ভালো যা, তাই করে এসেছেন, এবং সবচেয়ে ভালো যা, তাই করে যাচ্ছেন। সারা কাশ্মীর তাঁর অনুসরণ করবে।...

তেরো রাউন্ড গুলি করে তাঁকে মারা হয়!

গল্পভারতী একবিংশ গ্রন্থ ১৩৫৫ পৃষ্ঠা-২৬-৪০

স্ফটিকপাত্র

দিল্লি-পথের বহুবিশ্রুত এবং কাব্যে আদৃত ধূলি, যা নাকি মোগল এবং শিখেরা মিলে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছিল একদিন, এখন আর ওড়ে না।

উড়বে না। কোথা থেকে উড়বে? দেখাই যায় না তাদের। তাদের বাহিত অদৃশ্য কীটের দ্বারা ভালোমানুষের ছেলেদের স্বাস্থ্য আক্রান্ত হবারও ভয় নেই। আরেক ধরনের দৃশ্যকীটে ছেয়ে ফেলেছে দিল্লির প্রশস্ত রাজপথসমূহ।

উৎখাত বাস্তুছাড়া শরণাগতের দল।

অন্তত এইরকম একটা ধারণাই আমার হয়েছিল সেদিন মেল থেকে নেমে। প্ল্যাটফর্মে, শেডে, কোথাও আর পা ফেলবার জায়গা নেই যেন। গিজগিজ করছে লোক। ছেলের জন্মদান থেকে বৃদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত বিশাল বিপুল নাটকের যবনিকা উত্তোলন আর নমস্কার...শালীনতার পাতলা কাচ ভেঙে চুরমার করে আদমীয় নির্লজ্জতার সঙ্গে সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে।

দেখে দারুণ মজা লাগল, এই লোকগুলো সেদিন পর্যন্ত লাহোরে কী লায়ালপুরে, মুজঃফরাবাদ কী মুলতানে নিশ্চিন্তে নির্বিকারভাবে কাটাচ্ছিল, ঘচাং করে পরিবেশ পরিবর্তন, সঙ্গে সঙ্গে বহুযুদ্ধের খোলস খুলে আদিম জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া! চমৎকার!

আমি সরকারি চাকুরে। আরেকজন সরকারি চাকুরে আমার আত্মীয় এবং কেন্দ্রে আমার ওপরওয়ালা ও দূত। কথাটা গোপন রেখে লাভ নেই, তাঁর কৃপাতেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে অমন চাকরিটা ফট করে পেয়ে গেলাম।... এসেছি তাঁকে তৈলাক্ত করতে, উপলক্ষ্য তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশন। জীবনে এই প্রথম ভারতের মুকুটমণিতে অধমের পদার্পণ।— আর একেবারে গোড়াতেই যা অভ্যর্থনার ঘটা এই পুরোনো বহুভর্তৃকা নগরীর, তাতে একটু নাড়াই খেলাম। আশা ছিল মনের গোপন অভ্যন্তরে, নিদেনপক্ষে সে মধ্যযুগীয় আড়ম্বরের ছিটেটা-ফোঁটাটা আভাসে-ইঙ্গিতে পাব।... হায় রে পোড়ার ইতর কলিযুগের আমি, কোথায় কী?

থাক গে, টাঙ্গা নামক অর্ধ-খ এবং অর্ধ ভূ-যানে চেপে নবদিল্লির নসরতবাগ পাড়ায় এসে পড়লাম। ইংরেজের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দিল্লির সরকারি চাকুরে নামধেয় শূকরকুলের মতে এটা অভিজাত পাড়া। আমার উচ্চপদস্থ আত্মীয়টি এ-অঞ্চলের মানী লোক। সে-বাড়ির প্রচণ্ড উৎসবের দোর্দণ্ড কাণ্ডকারখানার কথা তুলে নাই বা স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করলাম।

কিন্তু পথে-দেখা বাস্তুত্যাগীদের দেখে কৌতূহল আমার উদ্রিক্ত হয়েছিল। অতি কৌতূহলী হয়েই নাকি বহু আবিষ্কারক এবং শিকারি প্রাণটা খুইয়েছেন। আমিও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মারাত্মকরকম ব্যাপারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। কেমন করে,

সেইটেই বলি।

...এই নূতন জাতের ভিক্ষুকদের দেখতে সেদিন দিল্লির কিছু দূরে এক রিফিউজি-ক্যাম্পে চলে গেলাম।

জীবনে ভুলতে পারব না সে পরিবেশ। একটা মাঠের মধ্যে নতুন খাড়া-করা ছাউনি, বাস্তুহারাদের বস্তি। ঘর থেকে ঘরে সরে গিয়ে একই দৃশ্য দেখতে থাকলাম, জীবনধারণের প্রত্যেকটা জিনিসই মনে পড়ে তাদের অভাবের দরুন। বীভৎস উলঙ্গ অভাব। নোংরা ছিন্ন কাপড়চোপড় আর কালিমাময় মুখচোখ। এই জানুয়ারি মাসে শীতে ওই ছাউনিতে হিম আটকায় কতখানি, সেটা গবেষণার বিষয়।

সে-সময়টাতে আবার কলেরার একটা মড়ক ওদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, একদল শুশ্রূষাকারী এসেছিল ওদের সেবা করতে। একটা ঘরে দেখলাম কলেরার ইনোকুলেশান্ দেওয়া হচ্ছে একটি মেয়েকে, রাশীকৃত চুল তার ছড়িয়ে আছে বমি-লাগা মুখটাকে ঘিরে, মাছি ঘিনঘিন করছে তার চারপাশে।... বেরিয়ে বারান্দায় নাকে রুমাল দিয়ে ভাবছি এটাই কুম্ভীপাক অথবা রৌরব কিনা, এমন সময় একটা প্রাণ-ফাটা চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম। ওপাশের ঘর থেকে চিৎকারটা এসেছিল, এখন কেমন চাপা গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে সেটা। এগিয়ে গেলাম, আর কী বৈচিত্র্য আছে, সেটা দেখতে।

...মাতাপুত্র। চিরকেলে ম্যাডোনার বিষয়বস্তু। মেয়েটির চেহারা সুন্দর ছিল বিস্মৃতপ্রায় কোন অতীতে, এখন ব্যথাদীর্ণ, বজ্রাহত, অশুচি মুখচ্ছবি। মুখ দিয়ে একটা বক্তব্য গোঙানি করে চলেছিল, কথাগুলো জড়ানো, তবু বোঝা যায় বলছে—"মুন্না মেরী, লাল মেরে—"

চুলগুলো আছড়াচ্ছে দুপাশে পা ছড়িয়ে বসে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। সামনে পড়ে আছে ফুটফুটে ছেলেটি, বমিতে পুরীষে মাখামাখি চেহারা। শেষ অবস্থা, খাবি টানছে।...মায়ের চিৎকার শুনে আমার সঙ্গে আরও কয়জন দৌড়ে এসেছিল। তাদের একজন ডাক্তারদের খবর দিল। একজন এল, পেছনে বেঁধে উৎসুক জনতা। গিয়ে বসল ছেলেটার পাশে, নাড়ি দেখল, মাথা নাড়ল। ইতিমধ্যে প্রায় পূর্ণ ঘরের শেষ দিক থেকে মাথা উঁচিয়ে আমি দেখছিলাম, ওরা আসতেই মা-টি কেমন আঁৎকে উঠে ছেলেটার পায়ের লাথিতে কুণ্ডলীকৃত কম্বলটা তুলে নিয়ে ঘরের কোণে চলে গিয়েছিল বড়ো বড়ো চোখ করে। ভিড় জমতেই ধীরে ধীরে এর-ওর-তার পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে এসে পড়ল।—ওদিকে ডাক্তারটি নিস্তব্ধ ঘরে সাড়া জাগিয়ে বললেন, ফিনিশড, অর্ডারলি।

আমি চেয়ে ছিলাম মায়ের দিকে। আচম্বিতে একটা হাওয়া মুখে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, হাত দুটো একবার অসীম আবেগে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল।

মা ক্ষণেক তাকিয়ে থেকে আমার পিছন দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ল। ডাক্তার ভদ্রলোকটি ততক্ষণ বলছেন—"এর কোনো আত্মীয় নেই?"

একজন জবাব দিল—"ছিল তো এখানেই।— কই দেখছি না এখন।"

দুষ্প্রাপ্য কীটের নমুনা দেখার একটা কৌতূহল চাগাড় দিয়ে উঠল মনে, মেয়েটির

অনুসরণ করে বাইরে চলে এলাম। বারান্দায় এক কোণে ভালো করে কম্বল মুড়ি দিচ্ছে মা। আমি কাছে যাই, দেখলাম মুখখানা, কেমন জমাট বেঁধে যাওয়া অভিব্যক্তি। ঠোঁট দুটো কিন্তু কেঁপে মৃদস্বরে গেয়েই চলেছে পৃথিবীর আদিমতম গান—

"মুন্না মেরী, মেরে লাল...লাল মেরী..."

বললাম "মায়ী, চলে এলে কেন? তোমায় খুঁজছে ওরা..."

মেয়েটি একটু নড়ে অদ্ভুত বোকার মতো হাসে। অস্ফুট দু-একটা শব্দ করে। তার পর চুপ করে থাকে।... আমি আবার প্রশ্ন করি— "ওরা ছেলেকে নিয়ে যাবে যে, খবর দাও? নইলে অজান্ অচিনভাবে—"

"অজান্ অচিনভাবে—" মেয়েটা আমার কথার পুনরাবৃত্তি করে। ওর হিন্দুস্থানি টানটা কেমন বাঁকা ধরনের, মহাপ্রাণবর্ণের ওপর ঝোঁকটা বেশি, লক্ষ করি আমি।... ও খানিক চোখ বুলোয় আমার চোখের ওপর, তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে, অধরটা অল্প অল্প কাঁপছে, সেই গুঞ্জনটা চলেইছে। একবার ধূলিম্লান দোপাট্টার প্রান্তভাগ বের করে নাকের জল মোছে, আবার চুপ করে থাকে...ওখানে কী দেখছে ও? ওখানে তো কেবল সোনার রোদ আর সবুজ ঘাস, জীবনরশ্মি আর জীবনধৃতি। ওসব দেখার অধিকার ওর আছে এ কথা ওকে কে বলল?

ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে দুটো লোক একটা নেয়ারের স্ট্রেচারে করে বাইরে রাখার জন্য। ওদের পায়ের শব্দে মেয়েটা তাকায় এপাশে চমকে, মাথা নাড়ার বেগে রুক্ষ সোনালি চূর্ণকুন্তল উড়তে থাকে, আমি চেয়ে দেখি। একটা হাহাকার ওর বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে বের হতে চায়, মুখটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে যায়। চাঁপার কলির মতো অথচ অতীব নোংরা আঙুল দিয়ে দুহাতে মুখ সজোরে চেপে ধরে সে।

মড়াটাকে নিয়ে ওরা চলে গেল।... আমি করুণাপরবশ হয়ে তার কম্বলের অংশ স্পর্শ করে বলতে যাই—কী বলতে যাই ঠিক জানি না। আমার বক্তব্য চিরকাল অকথিত বাণীই থাকবে। বলার আগেই মেয়েটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ ছটকে সরে গিয়ে বলে—"মত্ লো। গোড় লাগতি হুঁ।"...তারপর আবার সেই গোঙানোর চাপা আওয়াজ।

আমি বললাম—"ভয় পেয়ো না। ওদের আমি কেউ নই। কিন্তু অমন কেন করছ মায়ী?"

মেয়েটা কাটাকাটিভাবে জবাব দিল এবার—"জানলে...ওরা...কম্বল নিয়ে নেবে। কম্বল!...জাড়া, এই জাড়াতে...মেরী বাচ্চা..." আরম্ভ হয়ে গেল আবার সেই কম্পান্বিত সুরে সমান সময়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে আওড়ানো—"মুন্না মেরী, লাল মেরে..."

এতক্ষণে বুঝলাম সমগ্র ব্যাপারটা। মেয়েটি শ্রীলতা এবং পুত্র নিয়ে পঞ্চনদের তীর ছেড়ে এখানে বেণী পাকাতে অথবা না পাকাতে এসেছিল যখন, ও দুটো আর যা সঙ্গে ছিল, শীতবস্ত্রের তালিকা তার মধ্যে ওই কম্বলেই আরম্ভ এবং শেষ। পুত্র এবং সে বোধ হয় কাল রাত পর্যন্ত ওই এক জিনিসেই শীত নিবারণ করেছে। কাজেই নিজের পরিচয় দিলে ও-কম্বল এবং কাপড় কলেরার বীজসংক্রান্ত বলে কেড়ে নিত ওরা। এর আগে মেয়েটা নিশ্চয়ই আর কারও এমনটা হতে দেখেছে, অভিজ্ঞতার নতুন স্তরে মাতৃত্বের বিকাশ তাই এমনভাবে। যারা কেড়ে নেয়, তারা শুধু কেড়েই নেয়, দেয় না।

...মেয়েটার মুখের দিকে আর-একবার তাকালাম নবোদ্ভিন্ন জ্ঞানের আলো চোখে নিয়ে। সে তেমনি ঘাড়টি কাত করে বাইরেটা দেখছে।...মনে হল, যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে প্রথম যুগের পৃথিবীকে দেখছি, যখন পৃথিবীর ইতিহাসে শুধুই বর্ষাকাল, নিরবচ্ছিন্ন একটানা ব্রহ্মাবর্ষময় বর্ষাকাল।...হওয়ায় হাওয়ায় কেবলই হাহাকার আর বিলাপময় সংগীত, মেঘের তিমির অবগুণ্ঠনে দিগ্‌দিগন্ত ঢাকা, বৃষ্টিতে অবিরল ক্রন্দনের সুর সৃষ্টিময়,...মঙ্গলগ্রহ থেকে তার কতটুকু আভাস পাওয়া যেত?

কিন্তু এ আমার নিতান্তই কাল্পনিক ভাবোচ্ছ্বাস। আমি বাবা ওসব ভেবে কিছু করতে পারব না, ও তোমার সুখশয্যা পরিত্যাগ করে দেওয়ানা হয়ে বেড়াতেও পারব না। সাফ কথা। দেশময় লোক তো কাগজে এইসব দেখছে আর সিনেমার টিকিট কাটছে, আমিও।

এর পর এসব দেখার অভিরুচি আমার না থাকারই কথা। এরকম ঘৃণ্য জায়গায় এসে বেশিক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। নিতান্তই মেয়েলি বাষ্পসংকুল ঝোঁকের মাথায় ওই পরিত্যাজ্য মেয়েটির অঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়েছিলাম—ওরে বাবা, কলেরার বীজ আমায় ধরলে বাঁচব না।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ওদের জগতের দিকে তাকাতে তাকাতে নবোদিত উল্কার মতো বাইরের দিকে সরে পড়ি। অনেকটা বোধ হয় সেইরকম ভঙ্গি হয়ে গিয়েছিল, রাজচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী স্টেট্‌স্‌ম্যানের শেষের পাতা ছবিতে ভরানোর জন্যে যে-ভঙ্গিতে শহর কলকাতার বস্তি পরিদর্শন করতেন।

কিন্তু ভাগ্য তখনও আমার ওপর বিরূপ। চরিত্রের দোষও অবশ্য আমার ছিল, চিরকালই আমি একটু বেশি কৌতূহলী। বিশেষ করে জন্তুজানোয়ার দেখাতে। কোথায় 'ইতি গজ' করেছিলাম জানি না, কিন্তু দর্শন তখনও আমার শেষ হয়নি যুধিষ্ঠিরের মতোই।

বাইরে বেরোতেই দেখি একদল নতুন বাস্তুত্যাগী এসে জুটেছে বিরাট পথ অতিক্রম করে সামনের মাঠে। দ্রষ্টব্য চেহারা তাদের। বোকার মতো থেমে ওদের দেখতে থাকি। তখন যদি জানতাম কী ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে, তবে কি দাঁড়াই আর!

ঝামেলাটা এল এক বুড়োর বেশে। বুড়োটার মাথায় মাটি-মাখা পাগড়ি থেকে পায়ের ভাটা নাগরা পর্যন্ত একটানা একটি কাব্য।—আর যাই হোক, কলেরার বীজ লোকটা ছড়াবে না। ভারতবর্ষের প্রতীক বলে যেসব ছবি দেখতাম সচিত্র ইংরেজি পত্রিকায়, তাই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে মুখের ভাঁজে ভাঁজে, পরতে পরতে। হাতের শিরাগুলো পরিদৃশ্যমান। মুখে একটা দিশেহারার ভাব ফুটে আছে সুন্দর!...কিন্তু তার জীবনটা বোধ হয় ঠিক কাব্য নয়, সুন্দর কি?—সে লোকটা আমার পরিষ্কার পোশাক দেখেই বোধ করি সোজা আমার কাছে চলে এল। মরবার আর জায়গা পেল না। কী বলব, আমার ঘুম হরে নিয়েছে ব্যাটা।

হাতে আবার মুঠিয়ে রেখেছিল কী একটা কাগজ। প্রশ্ন করল—"হিন্দু?"

মাথা নাড়ি। সে একটু ভেবে আবার বলে—"এ হিন্দু ভাই, একটা খোঁজ দেবেন আমায়?" কেমন চক্রান্তকারীর মতো হাবভাব ওর।

পোড়া কৌতূহলটা তখন তীব্রবেগে চারিয়ে উঠেছে। বলি—"কী খোঁজ?"

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখে, তার পর—আর এক পা এগিয়ে তার বোঁটকা গন্ধসমেত মুখখানা আমার কাছে আনে। আ মলো যা, অমন করে কেন?—ও বলে—"এই সরকারের ঠিকানাটা জানেন?"

ঘাবড়ে গেলাম।—"সরকার! কীসের সরকার?"

"আহাঃ," বিরক্ত হয় যেন লোকটা—"রাজ সরকার। হিন্দুস্থানের রাজ সরকার, তার সঙ্গে দেখা করা দরকার।"

"তার সঙ্গে!" আমি আর একদফা ভ্যাবাচ্যাকা খাই।—"আরে বুড়া, সরকার তো একটা লোক নয়, অনেক লোক, আমি-তুমি সবাই মিলে—"

ভাবলাম রাষ্ট্রগঠন পরিষদ আর Constitution Bill-এর সমস্ত কথা ওকে বলব কি না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বোধ হয়। কাজেই মহান আদর্শটা—"আমি-তুমি-সবাই-মিলে—" দিয়েই শেষ করলাম।

...,ওর পালা এবার ভ্যাবাচ্যাকা খাবার। এবং সেটা সে ভালো মতোই খেল দেখলাম। বলল ঢোঁক গিলে—"একটা লোক নয়? আমি-তুমি-সবাই মিলে? তবে—তবে আমি কী করি এখন! কার সঙ্গে দেখা করি?"

বিরাট রাজ্য ওর কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে এই বিশেষ বৈঠকটি বন্দোবস্ত না করার জন্যে। কষ্ট হল ভাব দেখে।—বেশ তো! দেখাই যদি করতে চাও, করো না দেখা পণ্ডিত জবাহেরলালজির সঙ্গে! তিনি তো সরকারের মাথা—"

"পণ্ডিতজি, পণ্ডিতজি..."লোকটা দু-চারবার নামটা বলে যায় পাখি-পড়ার মতো। হঠাৎ ওই নোংরা একটা থাবা দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে—"লিখে দাও-না, নামটা আমার মনে থাকবে না।"

খুব গল্প করার লোক পেয়েছিল যা হোক! সন্তর্পণে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে রুমাল ঘষি। তারপর বিরক্তি-ভরা গলায় বলি—"পণ্ডিতজির নাম শোন নি তুমি? দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে!...কোথায় বাড়ি তোমার?"

মুহূর্তমধ্যে লোকটা কুঁকড়ে নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিল। এ-ভাবটা আমার চেনা, ছোটো ছেলেকে আদর দিতে দিতে ধমক দিলে যেমন করে, ঠিক সেইরকম। আমার বাংলার চাষীরা যাকে ব্যথার ব্যথী ভেবে দুঃখের কথা বলে, সে যদি হঠাৎ আদেশের সুরে কথা বলে, তখন যেমন চাষিরা সুর করে কথা বলে, ঠিক সেইরকম। এই লোকটাও যখন কথা বলল, তখন মনে হল যেন চাকর প্রভুকে বলছে।—"বাড়ি লায়ালপুরের কাছে, চাষের খেতে মজুরি করতাম আমি।"

আমার আবার মায়া হয়। বলি—"কিন্তু বুড়া, পণ্ডিতজির সঙ্গে তোমার দরকারটা কী?" আদরের রেশ টানার চেষ্টা করি গলায়।

ও আবার নিজেকে খানিকটা খুলে দেয়। কথাগুলো না বললে যেন ওর চলছে না। বলে—"বাবুজি, আমার সওয়াল আছে।"

"কী সেটা?"

লোকটা হাতের মুঠো খুলে কাগজটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে তার সেই প্রচণ্ড ভীষণ গোপন কথাটা।—"আমার সম্পত্তির তালিকা।"

একটা খাটিয়া, দুটো ভঁইস, লাঙ্গল একখানা, কাপড়, তৈজসপত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি রীতিমতো অবাক! ওর হাতে ওটা গুঁজে দিয়ে বলি— "কিন্তু এসব কেন?"

"সরকারকে দেখাব। আমার সব দেবে আবার।" নিশ্চিন্ত গলায় লোকটা জানায়।

মাথাটা ঘুরছে, পেটের মধ্যে হাসি গুলিয়ে উঠছে। "এইসব ফেলে এসেছ, তাই পণ্ডিতজির কাছে চাইলেই—"

ও পরিষ্কার বলে,—"ওরা যে তাই বলল। বলল, ওখানে তোমার সব দেবে! হিন্দু ভাইদের দেশ—"

করুণা হল। লোকটা পাগলই। চুপ করে থাকি।

ও আবার বলে—"পণ্ডিতজি দেবে না এসব? চাইলে আমি পাব না?"

আমি হাসলাম। ছোট্ট করে বললাম—"হুঁ!"

ও আবার তাকিয়ে তাকিয়ে কী ভাবে। ওপাশটায় ওর সঙ্গীগুলোর মধ্যে জীর্ণ কাঁথা বিছিয়েছে কেউ, কেউ চুপ করে আছে, কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছে। বলাবলি করার কী আর ওদের আছে?

বুড়ো বলল—"বাবুজি, সেই পণ্ডিতজি কোথায় আছেন?"

"দিল্লিতে।"

"দিল্লি?" ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—দিল্লি তো নজদিক্। কাছেই তো।"

...ওকে আর বললাম না, বড্ড দূর দিল্লি! বহুৎটা! অনেক পথ!

লোকটা আবার নিস্তব্ধতার অতলে ডুবে যায়। নাঃ, এর মতো বুড়ো গাধাকে মিছিমিছি খাটিয়ে আর অলীক আশা দিয়ে কাজ নেই। বলেই ফেলি।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলি— "দেখো, তোমার মাথায় এসব কে ঢুকিয়েছে জানি না। তবে যেই বলুক, মিথ্যে স্তোক দিয়েছে! ও জিনিস এখানে আর তুমি পাবে না। ও-আশা ছেড়ে দাও।—আর পণ্ডিতজির সঙ্গে দেখা করাই বৃথা, হয়তো দেখা না-ও হতে পারে।—"

থেমে থেমে, অন্য দিকে তাকিয়ে, হাত-টাত নেড়ে, এতটা অবধি আমি এগিয়েছিলাম, তার পর ওর মুখের দিকে চাই।

চুপ করে শুনল সে কথাগুলো, একটা পেশিও তার নড়ল না মুখের। হাতের কাগজটা তেমনিভাবেই ধরা, মাটি-চষা লাঙ্গল-ধরা ফসল-ফলানো পেশি-শিরাবহুল হাতখানা থর থর করে কাঁপছে শুধু। চাষির হাত, ভারতবর্ষের হাত।

পরমুহূর্তেই একেবারে ভেঙে বসে পড়ল ও। দু-হাত দিয়ে কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে আর কাঁদতে থাকে।—তাও আমি চেয়ে দেখি।

...খানিকবাদে তাকাল আমার দিকে চোখ তুলে। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

বহ্নিশিখা জ্বলছে তার চোখে। কান্না-টান্না কোথায় উড়ে গেছে। দৃঢ়সংবদ্ধ চিবুকে আর বলিষ্ঠ চাউনিতে সর্বহীনের শেষ প্রতিজ্ঞার ভয়াবহ স্বাক্ষর।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে আবেগ-কম্পান্বিত গলায় বলেছিল লোকটা—"দুষমনটা কে?...কে দুষমন? একবার চিনতে পারলে তার টুঁটিটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে কাবার করে দিই!...জানতে একদিন পারবই, সেদিন?"— হুংকার দিয়ে বলে শেষ কথাটা—"সেদিন? বেঁচে থাকব, আমি বেঁচে থাকব...সেদিনের—"

ওরে সর্বনাশ! এ যে সিডিশান!...কলেরার বীজের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর।...উদ্দামবেগে ধেয়ে যাই পথের দিকে, বাব্বাঃ—

সন্ধেবেলা।...সারাদিনটা ভেবেছি ওদের কথা। এখন অন্নপ্রাশনের মতো এমন একটা বিশাল প্রয়োজনীয় উৎসবের অভ্যাগত—অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আবার—মুন্না মেরী, লাল মেরে, মেরে লাল...নজদিক্ দিল্লি...টুঁটি...টিপে...টুঁটি...

নিজের অজ্ঞাতেই একবার গলায় হাতটা উঠে যায়। সচকিত হয়ে দেখি বাড়ির মালিক সশরীরে আমায় ডাকছেন। তাঁর সঙ্গে যাই। সবার মধ্যে বসি। আমার বন্ধুদের মধ্যে। টেবিল থেকে পানপাত্র তুলে নেই।

...মুন্না মেরে, লাল মেরে...একটানা, একঘেয়ে।...লায়ালপুর...কোথায় লায়ালপুর?... সেখানে কী চাষ হয়, গম?...দুষমন...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক চুমুকে সোমরস গলাধঃকরণ করি, হাতে পানপাত্র।

কাচের গায়ে ফেনারা লেগে আছে, হাজারো তীব্র বাতির ঝলসানি তার এখানে-ওখানে। মাঝখানে আমি।...নিরুপদ্রবে নিজের প্রতিফলন দেখি স্ফটিকপাত্রে...

আর কী করব?

অগ্রণী নবপর্যায় ২য় বর্ষ বৈশাখ ১৩৫৬ পৃষ্ঠা ১০-১৬

চোখ

অ্যান্ডলে সাহেব সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন : "অমন থেকে থেকে চমকে উঠছ কেন, রায়?"...বড়ো বড়ো লাল চোখে রায় তাকিয়ে দেখেন তাঁকে। মাথাটা নিচু করে চোখের মণিগুলো ওপরে করে কবার টেনে টেনে পাতা ফেলেন তিনি। রুমালটা বের করে মুখ মুছে নেন। তারপর হাসেন—"কই, তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তোমার ঘরে এসে।...বড়ো রোগা হয়ে গেছ এ কয়েক দিনেই।" অ্যান্ডলে সাহেব বসলেন সামনে।

রায় সাহেব লম্বা লম্বা আঙুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে মটকাতে থাকেন।—যে স্বপ্নটা দেখছিলেন, সেটা বলবেন নাকি ওকে? নাঃ, কী ভাবতে কী ভাববে লোকটি কে জানে! আর তা ছাড়া ওসব...রায় শিউরে উঠে সশব্দে সোজা হয়ে বসলেন—ওটা নিশ্চয়ই স্বপ্ন।

অ্যান্ডলে ভালো করে ওঁকে লক্ষ করছেন। নিজে খুবই অস্বাভাবিক ব্যবহার করছেন? এসব স্নায়বিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো মানে হয় না। বলেন হেসে— "কী মনে করে অ্যান্ডলে?"

টেবিলের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে অ্যান্ডলে শুরু করেন,—"ট্রাইবুনালের রায় শেষ অবধি আমাদের পক্ষেই গেল তা হলে।...কর্তা বোধ হয় ইনস্যুরেন্স মানিটাও পেয়ে গেলেন।...তোমার তো কদিন খুব খাটুনি গেল এলাহাবাদে, কিন্তু কপালও তোমার ফিরে গেল, এ বলে রাখলাম। বুড়ো নওশেরবানজিকে বরখাস্ত করে কর্তা এবার তোমাকেই স্পিনিং-মাস্টার করবেন। তা ছাড়া, হ্যাঁ হে, কত মিলল এলাহাবাদের হেড অফিস থেকে?" ঝুঁকে পড়েন হাসিমুখে অ্যান্ডলে সাহেব।...হাসির ভাব তাঁর মিলিয়ে গিয়ে মুখে উদ্‌বেগের চিহ্ন দেখা দেয়।

রায় ওঁকে দেখছেন না। ওঁর পেছনে খোলা সাইড ডোর দিয়ে বাইরের অন্ধকারময় ইয়ার্ড।...দুটো কী ওখানে চকচক করছে না? দুটো চোখ।...রুক্মিণীয়ার চোখ দুটো, বড়ো বড়ো, টানা। নির্লিপ্ত চাউনি স্থির, অপলক।...ও-চোখের মানে কী, কী ভাব ব্যক্ত করছে ওরা? চিন্তিত হয়ে পড়েছেন রায় ওদিকে তাকিয়ে।

পাশের ব্লোরুমের চাপা শোঁ শোঁ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কচিৎ দূরের মিল-শান্টিং-ইয়ার্ডে ওয়াগনে ওয়াগনে ধাক্কা লাগার ঠং ঠং আওয়াজ...। অ্যান্ডলে বিচিত্র চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকেন। রায়ের ঠোঁট দুটো নড়ছে, পেছনের শূন্যতার মধ্যে কী অত কৌতূহলের বস্তু পেল সে? কেমন যেন ওর হাবভাব, থেকে থেকে চমকে ওঠে আর শূন্যকে দেখে।

বলেন অ্যান্ডলে—"তোমার শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে?"

আবার চমকে রায় ওর দিকে দৃষ্টি নামান—"না, মানে—শরীর আমার ঠিকই আছে।"

“তবে?”—প্রশ্ন করলেন অ্যান্ডলে। “আজই নেমে আজকেই কাজে আসা উচিত হয়নি তোমার, ওরকম স্ট্রেন গেল তো!...যাক্ ঘুমোও তুমি, আমি ঘুরে যাই টাইম-অফিসে। কাল তোমার বাংলোয় যাব বিকেলের দিকে।” অ্যান্ডলে উঠলেন।

রায় আস্তে করে মাথা নাড়লেন, ওঁর কথাগুলো যেন তাঁর বোধগম্য হয়নি।... অ্যান্ডলে ব্লোরুমের দিকে সুইং-দরজাটা ঠেলে বেরোতে গিয়ে ঘুরে তাকালেন। রায় জোর করে স্বাভাবিক হলেন।—আবার কী?”

অ্যান্ডলে থেমে বললেন—“তোমার কথাটা বলতেই আসা। মানে, জানো তো আজকে অ্যাটেনড্যান্স মাত্র ওয়ান-ফোর্থ। খালি লয়্যাল ওয়ার্কাররাই এসেছে।”

রায় বলেন—“কেন?”

—“তুমি না থাকার মধ্যে অনেক ঘটনা হয়ে গেছে। ওদের মাথায় কে ঢুকিয়েছে ওয়্যারহাউসের অগ্নিকাণ্ডটা নাকি ইচ্ছে করে করা। ইনস্যুরেন্সের টাকার লোভে আর ব্ল্যাকমার্কেটের মাল নষ্ট করার জন্যে ধরানো হয় আগুন। এইসব। খুনের ব্যাপারটাই ওদের—”

শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন রায়। আর্ত তাঁর চোখ দুটো। অ্যান্ডলে ভুরু কুঁচকে তাকান। রায় কষ্ট করে হাসেন একটু—“বলো, তার পর কী হয়েছে?”

—“ওরা বলছে খুনের ব্যাপারে তোমার হাত আছে। নানা কথা রটাচ্ছে এক-একজন।...ট্রাইবুনালের রায় শুনে ওরা বলে আজ সন্ধ্যেবেলায় মিটিং করে দাবি-টাবি করেছে নিরপেক্ষ তদন্তের, নইলে কাজে আসবে না।”

রায়ের হাতটা টেবিলের কোনাকে জোরে মুঠিয়ে ধরেছে, আঙুলের গাঁটগুলোকে সাদা লাগছে জোরালো বিজলি বাতিতে।

অ্যান্ডলে বলে যান—“রুক্মিণীয়ার ছেলে লোকটা কিন্তু আশ্চর্য। ডাবলিং-এ কাজ করত তো! ওই যে, ওঁদু না কী নাম। কাজে এসেছে ঠিক। এই শিফ্‌টেই আছে।...আচ্ছা, তুমি ঘুমোও।”

টাইম-অফিস ইনচার্জ অ্যান্ডলে এবার চলেই গেলেন। সুইং-দরজাটা বার কয় দুলে স্তব্ধ হল।...রায় বসে পড়েছেন আবার। মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে অবিন্যস্ত করে দিতে বেশ লাগে! আজ ট্রেন থেকে নামার পর থেকে কয়দিন আগের ঘটনাটা মাথার মধ্যে চেপে বসেছে, আর পাক খাচ্ছে। কিছুতেই আর তাড়াতে পারছেন না। ঘুমোলেন একবার, স্বপ্নে আরও ভয়ংকর হয়ে কথাগুলো দেখা দিল। তার চেয়ে চিন্তা ঢের ভালো, ঢের ভালো।...টেবিলের কাচে একটা আঁচড় পড়েছে, নখ দিয়ে খুঁটতে থাকেন একমনে রায়। আর ভাবনা।

মাত্র নয় দিন আগে। বাণিজ্যনগরী কানপুরের প্রান্তদেশে কালপি রোডের ওপরে রতনলাল কটন মিলসে পুরোদমে তখন নাইট্-শিফ্‌টের কাজ চলছে। স্পিনিং-এর চার্জে রায় সাহেব, মালিক লালা রতনলাল গুপ্তাজির মহা পেয়ারের লোক রায়। রাত শেষ হতে তখনও কয়ঘণ্টা বাকি।

বেয়ারা এসে ম্যানেজিং এজেন্টের পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাকসেনা সাহেবের

তলব জানাল। একটু অবাকই হয়েছিলেন রায়সাহেব। পি. এ..তো রাতে বড়ো একটা আসেন না। একটা টেনশন চলছে মজুরদের সঙ্গে, তার জন্যে যদি বা এলেন, তা তাঁকে আবার কী দরকার পড়ল? চিন্তাকুলভাবে রায়সাহেব গিয়েছিলেন ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে অফিস বিল্ডিঙে।

ঘুমকাতর চোখ নিয়ে পি. এ.-র কাছে যেসব কথা শুনেছিলেন সে-রাতে, সেসব আজ রাতে রায়সাহেব ভাবতে চান না। আর নতুন কথা তাতে এক প্রস্তাবটি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনিও জানতেন ইউনিয়ন থেকে নানা মতলব পাকানো হচ্ছে ওয়্যারহাউস সার্চ করানোর জন্যে, একবার কোতোয়ালিতে খবরও দিয়েছিল ওরা। বহু কষ্টে থামানো হয় ব্যাপারটা। এখন আবার তারা দিনরাত নজর রাখা শুরু করেছে প্রত্যেকটি বহির্গামী লরির ওপর। ওয়াচ-অ্যান্ড-ওয়ার্ড স্টাফেও ওদের দলের লোক আছে। কাপড়ের গাঁঠ ছাড়া আর কিছু যে পার করা যাবে সবার অজান্তে, এ-ভরসা ছিলই না। এরমধ্যে আবার ইউনিয়ন থেকে দৌড়াদৌড়িও চলছিল এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ, খবর পেয়েছিলেন ওঁরা।...রায় অবশ্য এসব ব্যাপারে কোনোভাবেই চিন্তিত হননি, এটা তাঁর মাথাব্যথাও নয়। কর্তার বেশ চোট লাগবে যে এবার, এ-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না।

এরই মধ্যে পি. এ-এর প্রস্তাব, ওয়্যারহাউসটা তাঁরই ঘরের পরের ইয়ার্ডে। কাজেই কাজটা তাঁকেই সারতে হবে, সেটা আজই রাত্রে। খাটুনির খুব বেশিকিছু নেই, চালের বস্তার সঙ্গে বেশ কিছু পেট্রোলও রাখা আছে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সিল-মারা তালার পেছনে।... টাকার অঙ্কটাতেও চমক ধরিয়ে দেয়। কর্তাকে খুশি করতে পারলে দ্রুত উন্নতির পথ চিরপ্রশস্ত।

চিরকালের স্নায়ুসবল বেপরোয়া রায়। কবুল করে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু শেষে যাবার পথে বার দুই থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হল। ইনার গেটের ওয়ার্ডারটা তাঁকে সেলাম করে দরজা খুলে দেয়। ঢুকে এক পা এগিয়ে রায় থামলেন, ভাবলেন পি. এ.-র কাছে আবার যাবেন।...লোকটা পাল্লা বন্ধ করতে গিয়ে অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। ওকে তিনি জানেন, ব্যাটা ইউনিয়নের দলের। চট করে সোজা হয়ে চলে যান তিনি ব্লোরুমের দিকে।

ব্লোরুমে গাঁঠ খুলে প্রেস-করা তুলোর চাপ ছেঁড়া হয় একদিকে, তার পর একতলার সমান উঁচু ফানেলটাতে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানে তুলোটা নরম হয়ে ধুনে হাওয়ার ধাক্কায় নল দিয়ে গিয়ে একটা কোণে জমা হয় টুকরিতে। টুকরিগুলো ভরতি হলে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা তুলো ও-ঘরে কাটিঙে নিয়ে যায় মজুরেরা।

গাঁঠের চাপধরা তুলো বের করে বিছুচ্ছিল যারা, তারা সবাই স্ত্রীলোক। ফ্যাক্টরি-আইন অনুসারে রাতে মেয়েদের খাটা নিবিদ্ধ হলেও নতুন বড়ো একটা অর্ডার এসেছে, কাজেই বাড়তি লোক হিসেবে এদের রাতের শিফ্‌টে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে সামনেই ছিল রুক্মিণীয়া। বয়স তার প্রায় পঞ্চাশ মতন হবে। শক্ত জোয়ান চেহারা। চুলগুলো কিন্তু সব সাদা হয়ে গেছে।—মেয়েছেলেটির প্রতি একটা অত্যন্ত বিরূপ ভাব পোষণ করেন রায়। অবাধ্য ঠিক সোজাসুজি নয়, কিন্তু কেমন একটা উগ্রভাব আছে ওর মুখে। আর ওর দৃষ্টিটি। হাজার ভেবেও তার মানে খুঁজে পান না তিনি। মালিক বা তার

পেয়ারের লোকদের দেখলে ও যেভাবে চেয়ে থাকে সেটা লক্ষ করে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

ও ইউনিয়নের একজন চাঁই। নরম-গরম বক্তৃতাও দিয়ে থাকে। একটা বেশ বড়ো সংখ্যার মজুর ওর কথায় ওঠ-বোস করে, লেবার অফিসারের কাছ থেকে তা জানতে পেরেছেন উনি। এখন দেখেন তিনি, কাজ করতে করতে উবু হয়ে বসে ঝিমুচ্ছে, হাত শ্লথ। অশ্লীল ভাষায় একটা হুংকার দেন রায়, চমকে নিরুৎসাহ হাত একবার কপালে ঠেকিয়ে কাজ করে যায় আড়চোখে তাকিয়ে। চোখটা সেইরকম স্থির, গা ঘিনঘিন করে ওঠে তাঁর। ঘুরে চলে যান নিজের ঘরে। দরজা ঠেলে ঢুকবার সময় একবার ঘুরে তাকিয়ে দেখেন উদ্ভাসিত শেডের একেবারে অপরপ্রান্তে বুড়িটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রায় সুইং-দরজা ঠেলে ঢুকে যান ঘরে। তাঁর ওপর বুড়িটার রাগ আছে বোঝেন তিনি, কড়া ওপরওয়ালা হলেই খানিকটা বিরাগভাজন হতে হয়। কিন্তু তাই বলে অমন একটা দুর্জ্ঞেয় চোখ করে চেয়ে থাকবে কেন সে?...যাক গে, এখন সামনের কাজটা শেষ করতে হবে। অস্থির লাগছে, চেয়ারে বসা যাচ্ছে না। শরীরের মধ্যে শিরশির করছে থেকে থেকে, একটা অধীরতা তাঁর মনকে ছেয়ে ফেলেছে। রাতও আর বড়ো বেশি নেই।...এই সময়, দেরি করা উচিত হবে না।

ড্রয়ার টেনে টুল-বক্সটা বের করে টেবিলে রাখেন। তারপর কী মনে করে একবার সুইং-দরজাটা ঠেলে ফ্লোরুমকে দেখেন।...ঘরের মাঝখানে রুক্মিণীয়ার সামনে ইনার গেটের দারোয়ানটা দাঁড়িয়ে। ও এখানে কী করছে?...মুখ তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে ওঠে। ইশারায় ডাকলেন ওকে। এসে সেলাম করে দাঁড়াল। প্রশ্ন করেন রূঢ় গলায়। একটা খাতা দেখিয়ে ওয়ার্ডারটা জানায় টাইমকিপার বাঁকেলালবাবু এটা ডাবলিং-এর সুপারভাইজারকে দিতে বলেছে। তাই এসেছিল।—রায় ওকে বিদায় করে ঘরে চলে এলেন।

ঘরের কোণে কিছু চট পড়ে আছে। ক্ষিপ্রহাতে নিয়ে দড়ি দিয়ে দ্রুত মুড়ে বাঁধতে থাকেন। তারপর একটা টর্চ এবং টুল-বক্সটা নিয়ে ইয়ার্ডে বেরিয়ে পড়লেন। অন্ধকারে ঢাকা ইয়ার্ড। কেউ নেই সামনে। শুধু গুদামটা নীরবে পড়ে আছে।...তারার চাপা জ্যোতিতে আকাশের পটভূমিতে ওটাকে দানবের মতো লাগে।...শরীর খারাপ লাগে উত্তেজনায়। বুকের টিপ টিপ শব্দ যেন বহুদূর থেকে শোনা যাবে।...ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে রায় নিঃশব্দ চরণে ওপাশের পাঁচিলের আঁধারে মিশে গেলেন।

ওপাশের মেশিনশপে লেদ মিস্ত্রিটা চেনা গলায় চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। আর কোনো শব্দ নেই।...রুক্মিণীয়ার সঙ্গে ওই ব্যাটা কীসের কথা বলছিল। রায়ের ভালো লাগে না মিলের মধ্যের আবহাওয়াটা, আজকাল যেন কেমন একটা হয়ে গেছে!—নজর রাখতে হবে ওই মেয়েটার ওপর এবার থেকে, সুযোগ পেলেই বরখাস্ত।

গুদামটার শেষে অনেক উঁচুতে জানালা। একটা লোহার মইয়ের মতো সিঁড়ি আছে তার পাশ দিয়ে ছাদে যাবার। ওটাও উঠতে হবে। দরজা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সিল মারা। কিন্তু সাকসেনা সাহেব জানিয়েছেন, বাইরে থেকে জানালাটা খোলার বন্দোবস্ত

আছে, শিকহীন জানালা।— পরে পচা ইলেকট্রিক তারের স্পার্কিং-এর ওপর দোষ চাপালেই হবে।

মইয়ের লোহার রাংগুলো শিশির পড়ে পিছল হয়ে গেছে, হাত সরে সরে যায়। রায়সাহেব ওপরে চড়লেন। শেষ ধাপে বসে তাকালেন নীচের অন্ধকারময় ইয়ার্ড আর দূরের শেডের দিকে। তারপর কোলের খোলা টুল-বক্স থেকে যন্ত্র বাছতে থাকেন।...নিজের স্নায়ুর ওপর নিজের এবং মালিকের বিশ্বাস আছে, সেটা কি ভুল? তবে অমন হাত কাঁপে কেন তার?...মুখে তার মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। কর্তার তাঁর ওপর অগাধ আস্থা, সবচেয়ে কঠিন কাজখানা তিনিই করেছেন আর জানালাটার ওপরেই অর্থ, পদোন্নতি, সম্মান। আজ রাতের কটা মুহূর্তের খাটুনি তাঁকে এনে দেবে সারা জীবনময় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সবার ওপরে নিশ্চিন্ততা।

জোরে হাত চালালেন তিনি।...কিছুক্ষণ বাদেই জানালাটা ঠেলা দিতে খুলে গেল অতি মৃদু শব্দ করে। টুল-বক্সে স্ক্রু-ড্রাইভারটা ভরে হাত ঝাড়েন তিনি। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। জানালার ভেতর মাথা গলিয়ে কয় মুহূর্ত দেখেন। তারপর টর্চ জ্বালেন সন্তর্পণে। থরে থরে সাজানো আছে বস্তা, নামতে কোনো অসুবিধেই হবে না। টুপ করে নেমে পড়েন তিনি।

বস্তা দিয়ে দিয়ে নীচে নেমে টর্চটা জ্বাললেন। সাকসেনা সাহেব বলে দিয়েছেন মাটির নীচের কালো মালের গুদামের মুখ হল পুব কোণের কাছে। মুখের কাছেই কিছু পেট্রোলের টিন আছে, অসুবিধে নেই।...হিসেব করেন তিনি, কোনটা পুব কোণ। কেমন ভ্যাপসা বদ্ধ হাওয়াটা। হাঁপ ধরে বুকে। পুরোনো বন্ধ গুদামটার অন্ধকার কেমন ঠান্ডা ও ভীতিকর। ভয় ভয় করে।...উনি দ্রুতপদে যান পুব কোণটাতে। বস্তার সারের পেছনে কাঠের পাটাতনের ডালা। টেনে তুলে টর্চ ফেলেন তিনি।

পেট্রোলের টিনে আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটা তুললেন তিনি। মুখের তারটা ছিঁড়ে ছিপিটা খোলেন। তারপর সমস্তটা উজাড় করে দেন ফোকরের আশেপাশে।...আর একখানা তোলেন তাড়াতাড়ি, মনটা ভেতরে ভেতরে অপরিসীম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খুললেন এটাও। ছড়াতে ছড়াতে এলেন জানালা পর্যন্ত। আবার টিন আনেন, আবার ছড়ান বস্তার ওপর। এই টেনে আনা আর ছড়ানো যে কতক্ষণ ধরে চলল, তার হিসেবজ্ঞান হারিয়ে গেছে। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেছেন তিনি।

শেষে জানালার ধারি-ময় পেট্রোল ছড়িয়ে শেষ টিনটা ফেলে দিয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালেন। ঘামে ভিজে হাঁপিয়ে তখন তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ।...রুমাল বের করে মুখ মুছে বস্তা বেয়ে ওপরে উঠলেন। জানালার নীচে এলেন তিনি।

কার যেন নিশ্বাস পড়ার শব্দ।...একেবারে পড়ে যাবার মতো হলেন রায়। জানালার পাশে ঘেঁষে গেলেন তিনি। বুকটা ভীষণ কাঁপছে।

...কোম্পানি কোনো দায়িত্বই নেবে না। যা করেছেন, এর সমস্ত ভার চেপে পড়বে তাঁর ঘাড়ে। ভবিষ্যৎহীন ভগ্নাংশ রায়।— এ কল্পনাও করা যায় না।— চোখ তাঁর জ্বলতে থাকে। কে ওটা? গুঁড়ি মেরে চেয়ে থাকেন তিনি।

...একটা মাথার ছায়া। খানিকটা। একবার একটু দুলে নেমে যায় আবার।...উনি

হিংস্রভাবে অপেক্ষা করেন।...আবার মাথাটা উঠল। উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করল। একটু একটু করে মাথাটা গলে এল ভালো করে দেখার জন্য।

বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁর হাত দুটো তার গলা চেপে ধরে।...একটা অস্ফুট আর্তনাদ মাঝপথে বন্ধ হয়ে আসে। উনি এক হ্যাঁচকায় দেহটাকে তার সিঁড়ির আশ্রয় থেকে ঘরের মধ্যে নামিয়ে আনেন। মনে তার কোনো অনুভূতি নেই, কেবল একটা অসীম বিস্ময়। একটা জিনিস তাঁকে অবাক করেছে ভারি। গলাটা অসম্ভব নরম, পেছনের একগোছা চুলও তাঁর হাতের পেষণের মধ্যে। কোনো মেয়ে।

মুখটা টেনে নিয়ে এনে সামনে ধরেন রায়। মেয়েটার হাত প্রাণপণে তাঁর বাহুতে আঁচড়ে যাচ্ছে।...তিনি কিন্তু অভিভূত হয়ে গেছেন। রুক্মিণীয়া। বুড়ির মুখ লাল, হাঁ বড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু চোখদুটো সেইরকম স্থির অপলকভাবে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। সে-চোখের ভাবটা কিছুতেই ধরতে পারেন না রায়, অনেকটা যেন ঘৃণ্য কোনো জীবকে দেখছে। ভয়ের কোনো লেশই নেই, বরং যেন লড়াই-এর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব। না, তাও ঠিক নয়, কী যেন একটা ভাব বোঝা যায় না।...জানালা দিয়ে আকাশের হাজারো তারার চাপা জ্যোতি এসে পড়েছে, রুক্মিণীয়ার চোখের সাদাগুলো চকচক করতে থাকে।...গায়ে কত জোর রাখে বুড়িটা? কত জোর?

—ধস্তাধস্তি করতে তিনি কিন্তু কার্যকারণ পারম্পর্য ভেবে যাচ্ছেন। ওয়ার্ডারটা নিশ্চয়ই সাকসেনার ঘর থেকে তাঁকে চিন্তাগ্রস্তভাবে বেরোতে দেখে সন্দেহ করেছিল। কুলি বস্তির মাথা এবং ইউনিয়নের চাঁই রুক্মিণীয়াকে তাই নজর রাখতে বলেছিল সে। নজর রুক্মিণীয়া রাখল বটে, কিন্তু সেও ভাবেনি এমনটা হবে। অনেকক্ষণ কোনো উচ্চবাচ্য না শুনে তাঁর ঘরে বোধ হয় উঁকি দিয়েছিল। ঘরে না দেখে খোলা দরজা দিয়ে ইয়ার্ডে বেরিয়ে হয়তো তাঁর টর্চের আলো গুদামের কোনো ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিল বা নড়াচড়ার শব্দ শুনেছিল। কিন্তু খবর না দিয়ে সে এমনভাবে একলা উঠল কেন?...কৌতূহল হয়তো, হয়তো ভেবেছিল ব্যাপার দেখে খবর দেবে বা অমনই কিছু।

কিন্তু মেয়েছেলেটা তো কিছুতেই কাবু হচ্ছে না। জোর মোচড় দিতে বাঁ-পা পিছিয়ে একটা বস্তায় ঠেস দেন উনি—

জগৎটা যেন ধসে নেমে গেল কোন অতলে। আর শব্দ যেন আকাশের সীমায় সীমায় প্রতিহত হয়ে চিৎকার করে ফিরতে লাগল। সবসমেত বস্তা সরে গিয়ে তিনি শান-বাঁধানো মেঝেতে এসে পড়লেন। কিছুক্ষণ ধন্ধ মেরে থাকেন রায়সাহেব। রুক্মিণীয়া তাঁর ওপরে এবার তাঁর গলায় ওর হাত...মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে, অন্ধকারটা ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে...প্রতিটি শিরা শান্ত হয়ে যায় ধীরে। তাঁর কবল থেকে বেরোতে না পেরে গলায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মোচড় দেয়।— তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো মেঝেতে চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করছিল, সহসা হাতে ঠেকে ছড়িয়ে-পড়া যন্ত্রপাতিগুলো। একটা বড়ো নম্বরের স্প্যানার স্পর্শের সাহায্যে বেছে নিয়ে সবটুকু শক্তি সংহত করে ওর মাথায় বসিয়ে দিলেন। ও গড়িয়ে পড়ে গেল। নিথর ওর হাত-পা। অজ্ঞান বোধহয়। রায় ওঠেন, বেপথুমান পায়ে আবার জানালায় উঠে যান। প্রাণপণ চেষ্টায় কবার জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন খোলা হাওয়ায় মুখ বাড়িয়ে। নৈশস্নিগ্ধতা তাঁর মাথার ভেতরের

দপদপানিকে কমিয়ে দিল খানিক।

অন্ধকার তরল। রাত শেষ হয়ে আসছে। জানালায় বুক লাগিয়ে অবশভাবে তিনি পড়ে থাকেন। তারপর নীচে আসেন, টর্চ নিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো কুড়োলেন। হাত ছড়িয়ে পড়ে আছে রুক্মিণীয়া, জ্ঞান ফেরেনি এখনো। রায় গিয়ে জানালা দিয়ে বেরোন। মই-এর ধাপে বসেন। ইয়ার্ডটিতে এখনও কেউ নেই। বস্তা পড়ার শব্দ তাঁর কানে অত বড়ো ঠেকলেও বদ্ধ ঘরের বাইরে বেশি দূর যায়নি।... দেশলাই বের করে কাঠি ধরালেন রায়। মাথাটা গলিয়ে কাঠিটা উঁচু করে ধরে দেখেন ভেতরটা।...মরুক। ওই ধিকি ধিকি তুলোর আগুনের চাপের তলায় ওর দেহ থাকবে পড়ে। তাতে রায়সাহেবের কী? ও-চোখ নিয়ে তো আর সে চাইতে আসবে না অমন ঠান্ডা ভয়ংকরভাবে।...

দিলেন কাঠিটা ফেলে।...চকিত-উদ্ভাসিত গুদাম ঘরে সে-রাত্রে তিনি শেষবারের মতো বহু নীচে রুক্মিণীয়ার নিষ্পলক দৃষ্টিটা দেখতে পেয়েছিলেন। সজ্ঞান সে। চাউনিটার মানে ভাবার শেষ অবকাশ সেই রাত্রে। অন্তত তাই ভাবলেন তিনি।

তারপরের ঘটনা সরল। অগ্নিকাণ্ডটা প্রথম তাঁরই চোখে পড়ে, কাজেই অবরুদ্ধ মিশ্রিত অনুভূতিকে প্রচণ্ড উচ্চকিত চিৎকারে মুক্তি দেবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হননি। উন্মাদের মতো আর সকলের সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টায় বহুক্ষণ পর্যন্ত খেটেছিলেন। দেহের বহু জায়গায় ফোস্কা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে থামলেন, তখন আগুন নিভলেও রক্ষা কিছুই পায়নি। ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপ গুদামঘরটা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধেতে পেট্রোলের টিনগুলো অবাঞ্ছিত মানুষের চোখে পড়েনি। পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেডের লোক নিয়ে মজুরদের দূরে ঠেলে রাখা হল, উন্মুক্ত গুদামঘরের অবশিষ্ট মাল চুরি যাবার অজুহাতে।

রুক্মিণীয়ার দেহ এবং জানালার অস্তিত্ব নিয়ে এমনভাবে ঘটনাটাকে দাঁড় করানো হল, যাতে সবারই মনে হল— রুক্মিণীয়া চুরি করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত আগুনটি বাধিয়েছে। তারপর স্বকৃত জতুগৃহের বেড়া-আগুনে নিজেকেই তার যেতে হয়েছে।...তবু গোল বাধালো ইনস্যুরেন্সের লোক, নানা আপত্তি তুলে। তাই ট্রাইবুনাল বসেছিল এলাহাবাদে, যেখানে হেড অফিস। প্রধান সাক্ষী হিসেবে গিয়েছিলেন তিনি। প্রচুর ফাঁক থাকা সত্ত্বেও শেষ অবধি সামাল দেওয়া খুব কষ্টকর হয়নি। লালা রতনলাল গুপ্তার ব্যাপার, ফাঁক ভরাট করতে তিনি জানেন।...তাঁর প্রতিও গুপ্তাজির নেকনজর অনেক বেড়ে গেছিল। এলাহাবাদে বাস্তব সত্য অর্থ বাদেও ঢের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন তিনি। এবার মনে হয়, ওঁর উন্নতির পথে কোনো প্রতিবন্ধক থাকল না।

বিকেলে তাই ভারি খুশি মনে কানপুর সেন্ট্রালে নেমেছেন।

আর রাতে তাঁর মন খারাপ। আবার নাইটশিফ্‌টের কাজ। রাত যত বাড়ছে, মাথার মধ্যে ততই গোল পাকিয়ে আসছে। বেশ ছিলেন এ-কদিন এলাহাবাদে, এখানে এসে রাতের বেলায় এই একা ঘরে বসতেই যত অসুবিধে এসে জুটেছে। বিশেষ করে ইয়ার্ডের অন্ধকারের দিকে চাইতে পারছেন না।— কেন অমন হচ্ছে তাঁর? তাঁর স্নায়ু...

কাচের ওপর ও-দুটো কী?...দুটো চোখ! এ কেমন করে হয়? কোথা থেকে টেবিলের কাচের ওপর দুটো চোখ এসে জুটল? এ হতে পারে না! পারে না!

প্রচণ্ড শব্দে ঘরটা মুখরিত হয়ে ওঠে। টেবিলের কাচে ঘুসি মেরেছেন রায়সাহেব। ক্লার্ক মুরারিবাবু এসে ঢোকে।...ওর সংবিৎ ফেরে। অন্য দিকে মুখ করেন তিনি— "কী দরকার?"

মুরারি হাতের কাগজগুলো দেখিয়ে বলে— "প্রোডাকশানের হিসেবটা—" রায় জানান— "পরে এস। ভোঁ-বাজার পরে," একবার ঢোক গেলেন তিনি। সেলাম দিয়ে মুরারি চলে গেল। আবার টেবিলের কাচের ওপর তিনি ঝুঁকে পড়েন। ওই তো! চোখ দুটো এখনও আছে।...ও, তাঁর নিজের চোখ। নিজের মুখের প্রতিফলন পড়েছে কাচে।...দু-হাত দিয়ে মোছার চেষ্টা করেন রায়। তারপর সজোরে হেসে উঠতে যান মাথা তুলে।

বাইরে ইয়ার্ডটা। অন্ধকার, যেমন সে-রাতে ছিল। খালি ওপাশের মেশিনশপের একাংশ দেখা যায়, ডুবুডুবু চাঁদের তির্যক আলো দেওয়ালে।...তার ওধারটায়, ভাবেন তিনি, ধ্বংসীকৃত ওয়্যারহাউসটা আধা-আলো আধা-আঁধারে ডুবে ভেসে আছে। দেখা যায় না এখান থেকে। ওখানে এখন কে দাঁড়িয়ে? কে তাকিয়ে দেখছে তাঁকে? দেওয়াল ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে আসছে এখানে। দুটো বড়ো ঠান্ডা চোখের দীপ্তি।

হঠাৎ ভয়ংকর ভয় জাগে রায়ের প্রাণে। অজানা একটা ভয়। অহেতুক শিশুসুলভ ভয়।— উনি প্রায় দৌড়ে ব্লোরুম পেরিয়ে ডাবলিং-এ চলে যান।

এ ঘরটা বিরাট। এদিকে তার কার্টিং, সেখানে পেঁজা তুলো যন্ত্রে মোটা মোটা নলীতে পরিণত হয়ে থাকে। আর এক দিকে ডাবলিং, সেখানে ওই নলিগুলো থেকে সুতো পাকিয়ে ওঠার প্রথম স্তরটা হয়।— জনবহুল জায়গাটা দেখতে লোকে অভ্যস্ত, তার থেকে বুঝি প্রাণহীন আর কিছু নেই, যখন সেটা পরিত্যক্ত পড়ে থাকে।— দুপাশে যেন খাঁ খাঁ করছে দানবীয় যন্ত্রগুলো, মনমরা লাগছে যে-কটি মজুর ঘোরাফেরা করছে, তাদের।

যন্ত্রগুলোর কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে রায় ঘুরতে থাকেন। এখানে-সেখানে হাত দেন, দুটো-একটা স্পিন্ডল পরখ করেন ঘূর্ণ্যমান অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে। আবার বসিয়ে সুতোর মুখটা পাকিয়ে জুড়ে দেন জমা হবার পাত্রের মুখের সাথে।...চোখ দুটো কিন্তু যেন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, কোথাও আর স্থির থাকতে পারছেন না।

ঘরের একেবারে এক কোণে একটা মেশিনের পার্শ্বদেশে ঝুঁকে পড়ে কাজ করছিল শ্রীবাস্তব, এখানকার সুপারভাইজার, নীরবে রায় তার কাছ ঘেঁষে যান, মানুষের সান্নিধ্য বড়ো ভালো লাগে।

"কী করছ?"

সুপারভাইজার সেলাম করে জানান কাউন্ট বদল করা হচ্ছে।

"দেখি, আমি করি।" কাজের মধ্যে যেন ডুবে থাকতে চান রায়। অনেকটা পিনিয়ন লাগানো এখানে, এবং এখান থেকেই সুতোর স্থূলত্ব নির্ধারিত হয়। হাত নেড়ে মেশিনের মোটর বন্ধ করতে বলেন। শ্রীবাস্তব বন্ধ করে অন্য আর একটা মেশিনের দিকে সরে গেলেন। মাথা নিচু অবস্থাতেই রায় হাত বাড়িয়ে স্প্যানার চান। উত্তর না পেয়ে মাথা তোলেন। হঠাৎ দেখলেন এ-মেশিনের মজুরটাকে।

ভঁদু। রুক্মিণীয়ার ছেলে। পাট্টা জোয়ান। নিজের মনে ভরতি সুতোর পাত্রগুলো সরিয়ে রাখছে।...আচম্বিতে রায়ের সর্বশরীর বেয়ে নেমে আসে একটা আশ্চর্য অনুভূতি। ভয়, না ঘৃণা?... রুক্মিণীয়ার ছেলে। তাঁর হাতে মরা রুক্মিণীয়া, তার ছেলে। ও এখানে কী করছে? তাঁর সামনে থাকার অধিকার ওকে কে দিয়েছে? ও সামনে থাকলেই মনে পড়বে সেই তাকে, তা হলেই আবার সেই চোখ।...বিজাতীয় একটা রাগে কাঁপতে থাকেন রায়। ওটাকেও— নাঃ।

লোকটার পিঠে সবুট একটা লাথি মারেন রায়— "এই, স্প্যানার লাও!"

আচমকা কী যেন হয়ে গেল। নীরবে লোকটা মাথা গুঁজে কাজ করছিল, হঠাৎ দেখেন রায় সে হাতটা উঁচুতে তুলে ধরেছে, একটা রডসমেত হাত। চোখ দুটোতে আলো পড়ে খদ্যোতের মতো জ্বলছে।...ও যে মারতে যাচ্ছে তাঁকে, এটা রায়ের মাথায়ই ঢুকল না। তিনি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠেছেন অন্য কারণে।

অবরুদ্ধ রাগ ফেটে পড়ার মুহূর্তে ওর চোখে কী ভাব?...রুক্মিণীয়ার চোখ পেল কোথা থেকে ও?

ভঁদুর উদ্যত হাত ক্ষান্ত হল। শ্রীবাস্তব ধরে ফেলেছেন তার হাত। আর একটা লোক আর তিনি মিলে কয়েক ঘা দিয়ে বেঁধে ফেলেন ভঁদুকে। এটা খুব অঘটন নয়। মজুরদের এ-ধরনের দুর্বিনীত ব্যবহার মাঝে মাঝে হয়ে থাকে।

রায় কিন্তু ওখানে নেই। তিনি ছুটে গেলেন অন্য দিকে, ওই চোখ দুটোর সামনে তিনি কিছুতেই থাকতে পারবেন না। মুরারির এককোণে বসার টেবিলের পাশে গিয়ে বসে পড়েছেন। সন্ত্রস্ত মুরারি উঠে দাঁড়িয়েছিল, পাগলের মতো তাকে জোর করে চেপে ধরে বসালেন রায়।

খবর পেয়ে অ্যান্ডলে সাহেব ছুটে এলেন। ওঁকে ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। বসিয়ে জল খাওয়ালেন। তারপর বললেন— "এখন কেমন বোধ করছ? শক পেলে ওরকম হয়।"

রায় স্তব্ধ হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। ওপরের ঠোঁট ঢেকে দিয়েছে তাঁর তলের ঠোঁটে। তেলতেলে হয়ে গেছে তাঁর মুখ। অ্যান্ডলে আবার বলেন— "মুরারিকে বসিয়ে রাখছি, বুঝলে, ও এখানে এসে বসুক। আর রাতও তো শেষ, পাঁচটা বেজে গেছে।"

রায় কথা বলেন না। অ্যান্ডলে তাঁর দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ উনি হাত চেপে ধরলেন। অবাক হয়ে অ্যান্ডলে তাকান। একটু ঝুঁকে চাপা গলায় খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে রায় বলেন— "ও তো মরে গেছে...কিছুতেই আর ফিরবে না।— তবে ভয়ের কী আছে? কিছু না!"

অ্যান্ডলে স্তোক দেন— "না, ভয়ের কিছু নেই।"

রায় পুনরাবৃত্তি করেন— "কিছু নেই।...শেষ হয়ে গেছে চোখ দুটো। কিছু নেই ভয়ের।"

মুরারিকে ডেকে বসিয়ে জোর করে হাত ছাড়িয়ে অ্যান্ডলে সাহেব চলে যান। রায়

মাথায় হাত রেখে বসে থাকেন নিথর হয়ে, তারপর মুরারির দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন— আচ্ছা মুরারি, ভয়ের কিছু যদি না থাকবে, তবে ওর ছেলের চোখ দুটো অমন হল কেন?"

মুরারি বার কয় ঢোক গিলে বলে—"আজ্ঞে স্যার?"

রায় তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন, ভয়টা আবার ফিরে এসেছে তাঁর। কম্পিত হাত তুলে বলেন— "ওই দরজাটা— ওটা বন্ধ করে দাও।...দাও বলছি!" ধমক দিয়ে ওঠেন তিনি।

মুরারি উঠে দরজা বন্ধ করতে যায়।—রায়সাহেব অতর্কিতে প্রচণ্ড হাঁক দিয়ে ওঠেন— "ওই চোখ দুটো।... ধরো মুরারি, ধরো।"

মুরারিও দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখেছে। ডাকে— "তুমি এখানে কী করছ? এসো এদিকে এসো তো!"

একটি লোক দরজার পাশ থেকে লক্ষ করছিল, একটু অপ্রস্তুতভাবে এসে ঢোকে। রোগা মতো লম্বা চেহারা, তেলচিটে পোশাক পরা। রায় বলেন ওকে, উইভিং-এর ফ্যান্সি জবার মিস্ত্রি। এ-লোকটার চোখ কিন্তু আলাদা ধরনের। কেমন নিষ্প্রভ, জ্যোতিহীন, মরা জন্তুর মতো।

মুরারি আবার প্রশ্ন করে ওকে। ভাঙা শ্লেষ্মাবহুল গলায় জানাল লোকটা, মেশিনশপে 'ডাবির' কতকগুলো পার্টস্ গ্রাউন্ড করাতে যাচ্ছিল, চিৎকার শুনে এদিকে এসেছে। মুরারি ধমক দিতে যাচ্ছিল, রায় ওকে বিদেয় করে দেন।— যাবার সময় একবার তাকিয়ে নিয়ে চলে গেল লোকটা।

মুরারি ভ্রূকুঞ্চিত করে ওর যাবার দিকে চেয়ে বলে— "ইউনিয়নের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি ও-ব্যাটা। নিশ্চয়ই আপনি কী বলছেন, শুনতে এসেছিল। ও—"

রায় ওর হাত ধরে বসিয়ে দেন..."এসো আমরা অন্য কথা ভাবি। তোমার মনে আছে, গত বছর উনাওতে গিয়েছিলাম রিক্রিয়েশান ক্লাব থেকে—"

...কথাগুলো একটানা হয়ে এল।... রায় মাথা দোলাচ্ছেন প্রবলবেগে। যেন একটা চোখের সামনে থেকে সরাতে চান...চোখ। খালি দুটো চোখ। কোণাগুলো একটু ওপর দিকে ওঠা, পাতা সাদা হয়ে গেছে কিছু কিছু। চোখের নীচের সীমারেখা দুটো ভীষণ মোটা; সুরমা না দিলেও কালো অস্পষ্ট রেখা আছে নীচে দিয়ে। চোখের কোণের চামড়া লোল হয়ে এসেছে। সাদা অংশে ছোটো ছোটো শিরা রক্তাভ হয়ে উঠেছে। প্রচুর, পুঞ্জ পুঞ্জ শিরা। আর তারা দুটো...

মুরারি সভয়মনে তাঁকে দেখে। রাত্রি জাগার রক্তচোখ, চুল উদ্‌ভ্রান্ত, জামাকাপড় অবিন্যস্ত,— প্রায় যেন উন্মাদ রায়সাহেব।— কথা বলে মুরারি ওঁর মাথা নড়ার সঙ্গে, সামনে চুলের গুচ্ছটার আন্দোলন সে সহ্য করতে পারছে না।

"ভঁদুকে স্যার—"

রায় মাথা না নড়িয়ে ওর দিকে তাকালেন। মুখটা ঈষৎ হাঁ, ভুরুদুটো একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ধারণ করছে, চোখ জান্তব জিঘাংসায় জ্বলছে। ভয় পেয়ে মুরারি চুপ করে যায়। খুব ছোটো গলায় তিনি প্রশ্ন করেন, "কী বলছিলে?"

অত্যন্ত নিরুৎসুকভাবে সে আরম্ভ করে— "ভঁদুকে স্যার পুলিশে দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। যেভাবে আপনার ওপর হাত তুলেছিল মনে হয় একটা কিছু সাংঘাতিক করে ফেলত।...এদিকে পুলিশের কথা শুনে কটা মজুর মহা আপত্তি শুরু করেছে। বস্তিতে ইউনিয়নের লোকদের খবর দেবার জন্যে।... কিন্তু এসব লোকদের স্যার শায়েস্তা না করলে—

আবার রায় বাধা দেন— "সকাল হয়ে যাচ্ছে, না?"

"হ্যাঁ স্যার।"

নিজের মনে কীসব হিসেব করেন রায়, তারপর হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, "—সকাল হলে আর কোনো ভয় থাকবে না। নিজেরই কাছে দিনের বেলায় বোকামো মনে হবে চোখ দুটো— কী বলো?"

একবর্ণ ঘুণাক্ষরে না বুঝলেও মুরারিকে সায় দিয়ে যেতে হয়। রায় খুব খুশি মনে বসে থাকেন সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে। ওপরওয়ালার সামনে বসে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে মুরারি।

ভোরের পাতলা হাওয়াকে কেটে কেটে দিয়ে ছ-টার ভোঁ বাজতে শুরু করল।... ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফর্মার রুম থেকে মেন সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হল। সমস্ত ফ্যাক্টরিময় কলগুলো চলতে চলতে থেমে আসে...পায়ের খসখস, মানুষের গলা, মাল নড়াচড়া করার শব্দ ভেসে আসে ঘরে।...মুরারি উঠে দাঁড়িয়ে ঘুম-জড়ানো চোখে চেয়ে বলে—"স্যার ভোঁ পড়ে গেছে।"

"অ্যাঁঃ!"— রায় দুবার দ্রুত চোখের পাতা ফেলে ওর দিকে চান— "যেতে হবে এবার? চলো।"

মুরারি ওঁর সঙ্গে চলে। অফিস বিল্ডিঙে অ্যান্ডলে সাহেবের কাছে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছুটি। ইনার গেট দিয়ে বেরোন ওঁরা। তারপরই স্তব্ধ হয়ে যান।"

বাইরের গেটটা বন্ধ। ডিউটি শেষ-করা লোকেরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে। দরজার ওপাশের রাস্তা থেকে বহুকণ্ঠের হট্টগোল ভেসে আসছে। যেন অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে, উত্তেজিত মানুষ।

রায় হাসলেন। বললেন— "দিনের আলো তো পড়েছে রাস্তায়। চলো যাই আমরা।"

মুরারি পর পর কবার ঢোক গেলে। রায় নিজের মনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলে গেলেন মেনগেটের কাছে। মজুররা সরে পথ করে দেয়। গেটের ওয়াচ-অ্যান্ড-ওয়ার্ডটা নীরবে সেলাম ঠুকে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।"

ওদিকে অফিস থেকে বেরিয়ে অ্যান্ডলে সাহেব মুরারিকে দেখেছেন। কাছে গিয়ে ত্রস্ত চাপা গলায় বললেন— "ও কোথায়? ভেতরে নিয়ে যাও ওকে।"

মুরারি দেখিয়ে দেয় সামনেটা। অ্যান্ডলের চোখ আর্ত হয়ে আসে। ছুটে যান তিনি গেটের দিকে।

রায় তখন ওয়ার্ডারকে বলছেন— "গেট খুলে দাও।"

ওয়ার্ডারটা জানায়— বাইরে বহু লোক হয়েছে, হল্লা বাধতে পারে, তাই—। ধমক দিয়ে ওঠেন রায়— "খুলে দাও!"

অ্যান্ডলে এসে হাত চেপে ধরেন— "দেখো রায়, ট্রাবল্ ব্রুইং। ওই পেছনের ম্যানহোল ডোর দিয়ে তুমি চলে যাও। সোজা বাংলোতে চলে যাবে, আমি আসছি।"

উন্মত্ত দুটো চোখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকান রায়।— "তুমি বুঝছ না, হাওয়া আলো।— মিলের মধ্যে দম আটকে গেছে আমার।— কই খেলো!"

ওয়াচ-অ্যান্ড-ওয়ার্ডটা চাবি লাগিয়ে দরজা খুলে দিতে থাকে। অ্যান্ডলে রায়কে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন। পরিপূর্ণ উন্মাদ। রায় তার দিকে চেয়ে আস্তে হাত ছাড়িয়ে উচ্চকিত প্রাণখোলা হাসি হাসতে থাকে— "দিন!"

অ্যান্ডলে ক্ষিপ্রহাতে ওঁকে জড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন।— দরজাটা খুলে গেল। অ্যান্ডলে থমকে গেছেন।

বণিকশহর কানপুরের চিমনিতে চিমনিতে গাঁথা ধূম্রমলিন আকাশে তখন সূর্য উঠছিল। আর তার আলো পড়েছিল সম্মিলিত মজুরদের গায়ে মাথায় চুলে। শান্ত নীরব হয়ে তারা চেয়ে আছে রায়ের দিকে। আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সেই ফ্যাঙ্গি-জবারটি। অঙ্গুলি সংকেত করে আছে তাঁর দিকে।

রায় আঁতকে ওঠেন। লোকগুলোকে পরোয়াও তিনি করেন না। সেই চোখ দুটো। সবার চোখে। সমস্ত জমায়েতের চোখে ছড়িয়ে গেছে রুক্মিণীয়ার মৃত চোখের চাউনি।

—এতক্ষণে অকস্মাৎ বোঝেন তিনি সে চাহনির মানে। হিসেবের ভাব আছে তাতে। কতক্ষণ পরে টেনে নিয়ে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে একেবারে, তারই হিসেব।

রুক্মিণীয়ার চোখও সেই হিসেবই করত।

তীব্র তীক্ষ্ণ পরিত্রাহি চিৎকারে অ্যান্ডলের বুকের হৃৎপিণ্ডটা কয়েকটি স্পন্দন হারায়। রায়ের কোটর থেকে চোখ দুটো যেন বের হয়ে পড়ে যাবে, মুখে সেই চিৎকার তখনও চলেছে।...

হাতটা স্থির, অবিচল হয়ে নির্দেশ করছে তাঁকে। নিশ্চিত, অনিবার্য সংকেত আর সেই হাতের পেছনে অতগুলো চোখ। রুক্মিণীয়ার অত চোখ। চুপ করে, নিষ্পলক হয়ে দৃষ্টিগুলো পাতা রয়েছে তাঁর ওপর।...ওগুলো যেন এগিয়ে আসছে...ক্রমশ কাছে, মারাত্মকরকম কাছে...। তাঁর পৃথিবী ছেয়ে গেল ওই চাউনিতে। কত চোখ!... কত রুক্মিণীয়ার চোখ!

রায় ঘুরে দৌড় মেরেছেন ভেতরে কদর্য শব্দ করে।...পেছনে ধাওয়া করে যায় চোখগুলো, তাঁর পথ-ছাওয়া সেই চোখে।...রায়কে কিন্তু পালাতেই হবে, পালাতেই হবে।

তাঁর পৃথিবীতে ও-চোখ থাকবে কেন?

অগ্রণী নবপর্যায় শারদীয়সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬ পৃষ্ঠা ৩৭৬-৩৮৮

কমরেড

পাঁড়ের দোকানের মোড়টা ঘুরছে ঝাব্বু।

চট করে গাছের আড়ালে চলে গেলাম। ও যেন আমাকে দেখতে না পায়। ও হনহন করে হেঁটে চলে আসছে চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিপাত ক'রে। এক বার ক্ষণতরে দাঁড়াল ; একটা হাত তুলে ঘাড়টা মুছে নিল। এত দূর থেকেও আমার মনে হয়, তার হাতটা কাঁপছে।...ও চলে এল এদিকে, আমার অন্তরালের গাছটিকে অতিক্রম করে গিয়ে উঠল বস্তির সামনের বাঁধানো চাতালটাতে। বস্তির বেশির ভাগ দরজাই বন্ধ, লোকগুলো সব মুষড়ে নিরুৎসুকভাবে ঘরের মধ্যে পড়ে আছে, অনেকে চলেও গেছে। ছেলেপুলের কান্না শোনা যায় না, নেড়ি কুকুরগুলো পর্যন্ত অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে রওনা দিয়েছে। মানুষ থেকেও নীরব, অন্ধকার পরিত্যক্ত মনে হয় সমস্ত মহল্লাটাকে।

আমার পরমবন্ধু ঝাব্বু। আমার জঙ্গি ইউনিয়নের প্রিয় নায়ক ঝাব্বু। কতদিনকার সুখ-দুঃখের সাথি ঝাব্বু— সে চকিত চাহনিতে দেখে বস্তিটাকে, তারপর দ্রুতপদে গিয়ে ঢোকে তার ঘরে। দরজা বন্ধ করার শব্দ নীরব সন্ধ্যায় আমার কানে এসে বাজে।

আমি বেরোলাম গাছের আড়াল থেকে। হাতে এখনও কাপড়ের পোঁটলাটা। আমার সাধের মখমলের পাগড়ি, বউ-এর জংলা শাড়ি, আরও কী কী যেন ধরে দিয়েছে বউ। বিক্রি করতে চলেছিলাম সদর বাজারের লখিম মাড়োয়ারির ঘরে, হঠাৎ ওকে দূর থেকে দেখে আমার যাওয়া আর হল না।

ও ঢুকছিল কলের মালিক শ্রীবাস্তবের সদর বাজারের নতুন বড়ো বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে। সঙ্গে আর যে দুজন ছিল, তাদের আমি চিনি। একজন নয়া তাঁবেদার ইউনিয়নের নতুন-আসা গুন্ডাটা ; আর-একজন ম্যানেজারের পেটোয়া চুকলিখোর নন্দ মিস্ত্রি, শিকায়েত করার এক নম্বর ওস্তাদ। প্রথমে আমার ভয়ই লেগেছিল, দোকান ছাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়েছিলাম যদি কোনো সাহায্য লাগে ঝাব্বুর, তারই জন্যে। ওরা কেন নিয়ে যাচ্ছে ওকে? কিন্তু গিয়ে দেখি ঝাব্বু হাসছে, ভীষণ আনন্দিতমুখে হাসছে। তখনই আমি দৌড়ে চলে এসেছি সোজা মহল্লাতে। মাথার মধ্যে সব কেন জানি বেহিসেবি হয়ে গিয়েছিল। থেকে থেকে প্রাণের ভেতরটা চমকে চমকে উঠছিল।

আমিও গিয়ে চড়লাম চাতালে। ওর ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। বস্তির সামনেটা আর দরজাগুলো দেখলে কান্না পায়। গত একচল্লিশ দিন ধরে কলে লকআউট, দুর্দশাটা একেবারে চরমে এসে উপস্থিত হয়েছে। মজুরদের এ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে ভাঙন ধরানোর জন্যে কত চেষ্টাই তো করল মালিকপক্ষ, কিছুতেই কিছু হয়নি। কত মজুর দেশে চলে গেছে, বহু সংসারে নেমে এসেছে মহা-বুভুক্ষার ছায়া, কত মজুরকে এরই মধ্যে তার সব সম্বল বিক্রি করে ফেলে একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকতে হচ্ছে,— তবু জনসংহতি অচল বিদ্রোহে উঁচু হয়ে থেকেছে। নয়া ইউনিয়নের মুষ্টিমেয় সভ্যকে দিয়ে

টিমটিম করে চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তারা নিজেরাই ভয় পেয়ে রাজি হয়নি। মালিক নাকি বলেছে, তার টাকার আর দরকার নেই, কল সে বন্ধ করেই দেবে বেশি ঝামেলা হলে। অথবা বিলাসপুর না কোথা থেকে নতুন মজুর আমদানি করে কল চালাবে। গুণ্ডা লাগিয়ে ঝগড়া বাধাবারও চেষ্টা করেছিল একবার। সবকিছুকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে আমরা অনমনীয় থেকে গেছি।

কিন্তু কষ্ট হয়। এইসব তিল তিল করে মরা শহীদদের অবর্ণনীয় কৃচ্ছ্রসাধন মনকে বিচলিত করে তোলে।... এদের সহিষ্ণুতার তুলনা কোথায়? চোখের সামনে অল্পে অল্পে জীবনীশক্তি নিভে আসছে প্রিয়জনের, এ দেখেও যাদের মুখ ফেরাতে হয়, চোখের জলকে দাবিয়ে দিয়ে দিবারাত্র লড়াই-এর প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করে তুলতে হয়,— সেই জঙ্গি ফৌজের থেকে বড়ো কী আছে?

ঝাব্বুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বন্ধ দরজা। মানুষ যেন ওর ওদিকে থাকে না, এমনই শব্দহীন ঘরটা। আলো নেই, আলোর বিলাসিতা করার সুযোগ কার আছে? ঝাব্বুর গলা পাই না।...ঠক ঠক করে দরজায় ঘা দেই।

দরজার ওপাশে কার পায়ের আওয়াজ জেগে ওঠে। দরজার খিল খোলার শব্দ হয়। ঝাব্বু পাল্লা খুলে দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সকলের নেতা ঝাব্বু। শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামী সৈনিক ঝাব্বু।

আমাকে দেখে ছাই-এর মতো যার মুখ হয়ে গেল, সে সেই ঝাব্বু? হতে পারে না। আমি সর্বহারা ভুখা মজুর, আমাকে দেখে ওর মুখ ছাই হবে কেন?

হাসার চেষ্টা করে ও। "এসো লালবাহাদুর, বোসো। তারপর, কী মনে করে?" আনন্দ এবং উৎসাহের অভাব ওর গলা দিয়ে যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। একটা হাত পাল্লা থেকে সরিয়ে কোণের তেলচিটে বিছানাটা দেখিয়ে দেয়।

ধূসর অন্ধকার ঘরটাতে। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। অভাব যেন হা-হা করে এসে মুখে সজোরে চড় মারে। ও বলে— "দাঁড়াও, বাতিটা জ্বালি।...জানো তো, ও-পাট চুকিয়েই ফেলেছি প্রায়।"

আমি বাধা দেই— "থাক ভাই। আলোর দরকার নেই। এসো, বসি।" আমি বসলাম বিছানার ওপর হাতের পোঁটলাটা পাশে রেখে। ও বসে কামিজের পকেট হাতায়, যেন একটা কিছু না করে ও স্থির থাকতে পারছে না— "বিড়ি খাবে?"

"দাও।"

বিড়িটা মুখে নিয়ে মাথাটা নিচু করি। দেশলাই বের করে নিজেরটা ধরায়, তারপর আমার মুখের কাছে জলন্ত কাঠিটা অগ্রসর করে দেয়। ধরাতে ধরাতে ওর চোখের দিকে তাকাই। দুটো শিখা জ্বলছে ওর চোখের তারা দুটোতে, চোখ কিন্তু নিষ্প্রভ, ভগ্নাশায় ভরতি। আমার ধরানো হয়ে গেলেও মুখ ঝুঁকিয়েই তাকিয়ে থাকি। ও কেমন অস্বস্তি বোধ করে, চোখটা সরে যায় অন্যদিকে। আবার আমার মুখের ওপর আসে। আবার আমার মাথার ওপরের জানালা দিয়ে বাইরে ন্যস্ত হয়।

মুখ তুলে আমি বলি— "বিড়ি কেনার পয়সা এখনও আছে তোমার?"

"না।" ও কাঠিটা ফেলে দেয়— "হঠাৎ ভয়ংকর ইচ্ছে হল বিড়ি খাবার। তাই কিনে নিলাম দু-পয়সার। থাকতে পারলাম না।"

"বেশ।" একমুখ ধোঁয়া ছাড়ি আমি— "জরু কোথায় তোমার? ছেলেপুলে কারো তো গলা পাচ্ছি না আমি!"

"ওদের সব আজ সকালেই ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। কতদিন এমন থাকবে কে জানে বলো! সেখানে তাও দুমুঠো খেতে পাবে দুবেলা। তুমি তো গত কয়দিন এদিকে আস না— আজ হঠাৎ?"

"বলছি"— মনে মনে হিসেব করি আমি। তা হলে আজ বিকেলের ঘটনাই প্রথম নয়, অন্তত দু-তিনদিন ধরে শলা-পরামর্শ চলছে।... ছোটো ছেলেটা হবার পর থেকে ঝাব্বু নরম হয়ে পড়েছিল, বউ-ছেলে পার করে দিয়েছে গণ্ডগোল আশঙ্কা করে।

মুখে বলি— "কাল আমেদ সাহেবের আসার কথা আছে। আজই সকালে আপিসে খবরটা এসেছে। তুমি দু-তিনদিন ধরে ও-পথই মাড়াওনি, অথচ ব্যবস্থা করা দরকার—"

ও ইতস্তত করে— "মানে শরীরটা বড়ো খারাপ যাচ্ছে কদিন থেকে। কোথাও যাচ্ছি না। খালি সকালে ইস্টিশনে ওদের তুলে দিতে গিয়েছিলাম। জানো, বাসন-কোসন বেচে তবে ওদের যাবার পয়সা জোগাড় করতে হয়েছে। আর পথে বেরোলেই তো পয়সা।"

আমি বলি—"তবে ঘরে কামিজ পরে বসে কী করছ?"

—"উঁ"— চিন্তাপূর্ণ চোখে ও আমার দিকে চায়— "এমনি। বেরোব ভাবছিলাম। একা ঘরে যেন দম আটকে আসছিল।"

—"ওঃ" আমার কৌতূহল যেন নিবৃত্ত হয়— "কিন্তু বিড়ি কিনলে কখন ভাই?"

চমকে উঠল ঝাব্বু। সোজা হয়ে বসল। "সকালে, বউকে উঠিয়ে দেবার সময়। এসব প্রশ্ন কেন করছ ভাই বলো তো?"

উত্তর দিই না। চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ও রূঢ় হবার মতো সাহসটুকুও সঞ্চয় করতে পারল না। হঠাৎ উঠে ঘরের অন্ধকার কোণে হাতড়ে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢেলে ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়। আমি বিড়িটাকে মেঝেতে দাবিয়ে দাবিয়ে নিভিয়ে দিই।...ও ঘুরে আসে।

বলি— "হ্যাঁ, যেজন্য আসা। আমেদ সাহেব এলে কালকে একটা জমায়েতের আয়োজন করতে হবে। এ কাজ তুমি ছাড়া—"

—"জমায়েত?" প্রশ্ন করে সে। "হ্যাঁ, জমায়েত তো ডাকতে হবে। দ্যাখো।" হঠাৎ ও ঝুঁকে পড়ে আমার কাছে— "লালবাহাদুর, একটা কথা বলব?"

"হ্যাঁ, বলবে বই কী! লড়াই-এর নতুন ধাপে, যখন মানুষের মনের বল পেটের ভুখ নরম করে দিচ্ছে, তখন ঝাব্বু ছাড়া আর কারো কথায় তো কোনো ফল হবে না ভাই।"

ঝাব্বু উদ্যত ভাবটা সংবরণ করে নেয়। খানিক চুপ করে থাকে। আমি বলি—

"কী বলতে যাচ্ছিলে?"

ঝাব্বু মুখ না ঘুরিয়ে আড়চোখে আমাকে লক্ষ করতে থাকে। তারপর শান্ত গলায় বলে— "লালবাহাদুর, তুমি আমার সবচেয়ে বড়ো দোস্ত। কিন্তু সে-সম্পর্ক ভুলে একবার মজুর হিসেবে আমার গোটাকয় কথা মন দিয়ে শোনো।"

কথা বললাম না। একটু চুপ থেকে আবার ধরে ও— "আমার ওপর মজুরদের বিশ্বাস আছে। আমার কথাগুলো মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা তারা নিশ্চয় করবে, আর মানবে।"

সেই-ই আমার ভয়। সেই আমার গৌরবও।— হঠাৎ ঘরের মধ্যে তেরছা হয়ে একঝলক আলো এসে লুটিয়ে পড়ে, সামনের দোতলাটায় কে যেন আলো জ্বেলেছে।

ঝাব্বু বলে চলে। আমার কানে ওর উদ্‌গ্রীব, প্রায় মিনতি-ভরা গলাটা কেমন বিশ্রী লাগে।

ও বলে— "দ্যাখো, এ মহল্লার সব কটা ধাওড়া আমি ঘুরে দেখলাম। এটা কী অবস্থা হয়েছে।... মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে!"

—"তুমি কী বলতে চাও?" নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করি আমি।

—"আমি বলি এভাবে চলবে না। চলতে পারে না। মানুষগুলোকে এ-যন্ত্রণার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমিই ডাক দিয়েছিলাম, তাই কল বন্ধ হয়েছিল। এত লোকের জানের দায়িত্বভার আমি আর বইতে পারছি না।...তাই বলছি, আমাদের দাবি সম্বন্ধে মালিকপক্ষের আলোচনা করে একটা ফয়সালা করে ফেলা যাক।"

জানালার টুকরো আলো ওর গালে পড়েছে। কত উঁচু হয়ে গেছে হাড়টা। মুখ ভাঙা, চোখ কোটরে। ঝাব্বু কত রোগা হয়ে গেছে।...

প্রশ্ন করি— "ফয়সালা? আপোশ বলো। তুমি বলছ এ-কথা?" চুপ করে ভ্রূকুটি করে। নিজের কানে নিজের গলাই একটা দূরাগত বাজের ডাকের মতো হয়ে এল।

ঝাব্বু ব্যগ্রভাবে বলে— "কথাটা ওভাবে নিয়ো না। আমার মনে হয়, আমি জানি— আমাদের কিছু কিছু দাবি ওরা মেনে নেবে। তবে তো এ লড়াই করার কোনো মানে থাকে না।"

বলি আমি— "দাবি মানবে?... তুমি কী করে জানলে কথাটা?" দ্রুত বলে যাই শেষ বাক্যটা সোজা ওর দিকে তাকিয়ে।

ও জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। তারপর বলে— "আমার মনে হয়।" গলাটা কেমন ঠান্ডা হয়ে গেছে ওর।

জিজ্ঞাসা করি— "পর্‌কাশ ভাইয়াদের যে ছাঁটাই করেছিল, তাদের বহাল করবে ফের? তন্‌খা বাড়িয়ে দেবে কারিগরদের? সব মানবে?"

কিছুক্ষণ ধরে ভাবল কথাটা। তারপর বলল— "চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমার মনে হয়, কিছু কিছু মানবে ওরা।"

"কিছু কিছু!" আমার কথা বলার ইচ্ছেটা ক্রমেই কমে আসে।

ও বলে— "কিন্তু তবু দ্যাখো, এভাবে তিলে তিলে মরা আর দেখা যায় না। কাল আমেদ সাহেব এলে তাঁকেও বলব, জমায়েতকেও জানাব আমার সিদ্ধান্তের কথা। আমাদের ফের যোগ দেওয়া উচিত।"

হঠাৎ খেপে উঠি। উত্তেজিত কণ্ঠে বলি— "এগোবার পথটা নষ্ট করে দিতে চাও? এতদিন জানের খুন দিয়ে যে-সংহত শক্তি জমে উঠেছে, তার মূলে আঘাত করবে?"

ও বোঝায়— "ভুল করছ। আবার লড়াই হবে, আবার হবে। একটু সামলে উঠতে দাও। অল্প ত্যাগ করে এখন এতগুলো লোকের প্রাণ তো বাঁচাই।"

ওর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে। চোখ দুটো বোধ হয় আগুনের ভাঁটা হয়ে উঠেছিল। বলে করুণভাবে— "আমার পরম বন্ধু হয়ে তুমি এ কী সুরে কথা বলছ লালবাহাদুর? এতদিনের বুক ঢালা ভালোবাসা—"

—ভালোবাসা!... চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। আমার সঙ্গী ঝাব্বু। আমাদের সবচেয়ে বড়ো গৌরবের বস্তু জঙ্গি সিপাহি।...তাই-ই এই মুহূর্ত পর্যন্ত আছে সমস্ত মজুরের চোখে। আমার নবলব্ধ জ্ঞান এখনও অংশীদার পায়নি। ঝাব্বুর নামে এখনও সব পাগল।

ঝাব্বু বোধ হয় আমার চোখকে নরম হতে দেখেছিল। গায়ে হাত দেয়। ঘাড়টা শির শির করে ওঠে। কিন্তু হাতটাকে সরিয়ে দিই না। বলে— "ভাই, আমার অনুরোধ, ভালো করে বুঝে দ্যাখো..."

ওর গলাটা আমার কানে ছোটো হয়ে আসে। মনে পড়ে কতদিনকার কত কথা। কতবার দেখেছি, নিষ্পেষণের যন্ত্র চালু হলেই ঝাব্বুর গলা বজ্রকণ্ঠে রণহুংকার দিয়ে উঠেছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে সে-সময় আমরা সব ভুলে যেতাম। সত্যিকারের অগ্নিহোত্রী। কোনোদিন কোনোখানে পাপের সঙ্গে সন্ধি করেনি।

আজ এত নরম হল কী করে? পুরোনো বহু পোড়-খাওয়া যোদ্ধা আজ তার পৌরুষ হারিয়ে ফেলেছে। কেন? অর্থের কাছে শেষটা বিক্রি হয়ে গেল? এতই বড়ো পতন হল ওর।

আমার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ওর দু-হাত মুঠোয় নেই— "মাথা তোমার খারাপ হয়ে গেছে। কী ভালো, কী মন্দ, তা বোঝবার জ্ঞানও কি তোমার লোপ পেল? বিচার করে দ্যাখো, আপোশ মানে মৃত্যু। এ চেষ্টা ছেড়ে দাও। সবাই কী বলবে?"

—"সবাই?" আমার মুখের থেকে ঘন অন্ধকারের দিকে চোখ ঘোরাল সে। মুখে অপরিসীম দৃঢ়তার ভাব। "আপোশ করতে হবে...এতদিনকার নেতা আমি তোমাদের, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।"

নেতা! চাবুক এসে পড়ল আমার মুখে। ঝাব্বু নেতা, সেই কথা তার শেষ যুক্তি! আমি ভাবতে পারছি না, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভালো লাগে না, হাঁপ ধরে আসে যেন বুকে। এ কী নতুন প্রকাশ, কল্পনা করলেও মনে হয় পায়ের তলা থেকে

মাটি সরে গেছে। অন্ধকারটা যেন দুলে ওঠে। আমার মনে যে-আশঙ্কা জাগছিল বিকেলবেলা সদরবাজারে ওকে দেখার পর থেকে, সেটা সত্যে পরিণত হল। সত্য! কী ঘৃণ্য, জঘন্য বাস্তব।

ঝাব্বু কথা বলছে। কী বলছে কে জানে! কে তোয়াক্কা রাখে! মরা মানুষের ভূতুড়ে কথা।...আমার খালি মনে হচ্ছে, সেবার হাঙ্গামায় সে মরল না কেন? গত বছরের আগের বছর যে গোল বেধেছিল মালিকের সঙ্গে, তখন সে এগিয়ে গিয়েছিল অত্যাচারের বুলেটের মুখে। একটা গুলি এসে কেন ওকে শেষ করে দেয়নি? কেন ও বেঁচে থাকল?

অমঙ্গল চিন্তা করছি না। ওর সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা চিন্তা করা এখনও আমার পক্ষে অসম্ভব। ও চলে গেলে বেঁচে যেত! আমরা ওর শব কাঁধে করে মিছিল করতাম, দু-চোখ বেয়ে আমাদের জল ঝরত, ঝাব্বু বেঁচে থাকত তার প্রতিটি ফোঁটায়— জলকে আগুন করে দিতে সে পারত। বেঁচে থাকত আমাদের আশায়, আমাদের নৈরাশ্যে, আমাদের শেষ অবশ্যম্ভাবী পরম জয়ে। আমাদের শোকে সান্ত্বনা পেতাম তার কথা ভেবে, লড়াই-এ বল পেতাম তার কাছ থেকে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করতাম সে-মুখ স্মরণ করে।... তাকে মনে পড়িয়ে দিয়ে ডাকতাম নবীনদলকে, প্রতিশোধের আগুনে তাদের ধরিয়ে নিতাম মশালের মতো, সেই হত প্রেরণা।...তার পর, সমস্ত ঘটনার পর, নয়া দুনিয়ার বনেদ গড়তাম যখন, তার স্মৃতি হাওয়া হয়ে আমাদের চুলে নাড়া দিয়ে যেত। সমস্ত মজুর-কৃষাণ জমায়েতে তার হাসিমুখ জেগে উঠত। সেদিন সবচেয়ে বড়ো হয়ে বাঁচত সে।

সারাজীবন সংগ্রাম-করা সেই তো আমাদের ঝাব্বু।— এ লোকটা কে? নেতা? আমাদের কেউ নয়, অন্য জাত। এর চোখে রয়েছে ভীতি, বুকে রয়েছে লাভের লোভ, আর কামিজের জেবে রয়েছে টাকা। লোকটার চোয়ালটা ব্যগ্রভাবে নির্লজ্জ হয়ে বেশ্যাবৃত্তির বেসাতির কাজ হাসিল করে যাচ্ছে, তাতে বাইরের টুকরো আলো পড়ে তেলতেলে চকচকে লাগছে আর খালি নড়ছে। ওর মতো বেইমান এ-তল্লাটে আর একটি নেই। একে আমি চিনি না।...আমার পয়লা নম্বর দুশমন, আমার ঝাব্বুর সারাজীবনের ঘোর শত্রু, হাজারো ভুখা মজুরের রক্ত-চোষা ভাড়াটে নেতা।

হাত নেড়ে ও খুব বোঝাচ্ছে।...এতক্ষণ স্থাণুর মতো বসেছিলাম, এবার নড়ি। পাশের পোঁটলা থেকে আমার সাধের মখমলের নরম পাগড়িটা বের করতে থাকে আমার হাত।...

না। ও আমার বন্ধু। আমার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু। কতবার ওর নেতৃত্বে আমাদের দুঃখদুর্দশার জন্যে লড়েছি, কতবার কতভাবে ওর কাছে ঋণী হয়েছি। দুর্বল লাগে নিজেকে, এ আমার সাধ্যাতীত। পালিয়ে যাই বরঞ্চ, কেন এলাম আমি? তলের ঠোঁটটা আমার অবরুদ্ধ কান্নাকে রুখতে গিয়ে থর থর করে কাঁপে, মাথার পেছনটায় চাপ ধরে আসে।

তারপর ওর কথা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। রাত্রি গভীর হল।

আমি প্রাণপণ শক্তিতে পেঁচিয়ে দিয়েছিলাম কাপড়টা। ওর মুখটা আমার খুব কাছে চলে এসেছিল। জিভ বেরিয়ে গেছে, কপালে বড়ো বড়ো ঘামের ফোঁটা, চোখ রক্তাভ।

ভালো করে কাপড়টা আর একবার মুঠিয়ে নিয়ে জোর দিলাম। হাত-পাগুলো ছড়িয়ে পড়ে, একটা হাত আমার জামাকে খামচে ধরে টানতে থাকে, পড়পড় শব্দে খানিকটা ছিঁড়ে যায়। সব আমি লক্ষ করি লালচে-কালো একটা পর্দার ভেতর দিয়ে যেন। আর আমি যেন সমস্ত ঘটনাটার একজন দর্শক, এমনই ঠান্ডা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেছে মনের ভেতরটা।

ছটফট করতে করতে ও নেতিয়ে পড়ল। ক্রমে ওর হাত-পা-এর আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে এল।...ছেড়ে দিলাম।

গড়িয়ে আমার কোলের ওপর ওর মাথাটা এসে পড়ে। জানালা দিয়ে আসা বাইরের আলো এবার ওর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের বীভৎস সংকোচন কমতে কমতে থেমে এল। ওর হাতটা আমার বুকের কাছে ছেঁড়া জামা ধরেই থাকে। একটানে কাপড়টা খুলে নেই গলার প্যাঁচ থেকে।

ওর কপালে কয়গোছা চুল এসে পড়েছে দেখছি তখন থেকেই। আর চওড়া কপালময় বড়ো বড়ো স্বেদবিন্দু। কেমন ধীর, কেমন তৃপ্ত দেখতে লাগছে ওকে ; ঘুমের প্রশান্তি যেন ওকে ঘিরে নেমে এসেছে। চোখ দুটো ধীরে আনমিত করে বন্ধ করে দেই।

তখন থেকে দেখছি ঝুঁকে পড়ে, জলে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা মুখ।

তারপর কম্পিত মৃদুহাতে ওর গুচ্ছ গুচ্ছ চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিতে থাকি সযত্নে।

ফতোয়া প্রথম সংকলন বৈশাখ ১৩৫৭ পৃষ্ঠা ৪৬-৫৪

সড়ক

মাঝখানে রাস্তা, দু-পাশে ফুটপাথ। রাস্তার কালো পিচের মসৃণ সুডৌল পিঠ, তার ওপর ঝলসাচ্ছে সূর্যের আলো। গাছের পাতায় ছায়ারা জাফরি কেটেছে সারা পথময়। বেলা দুপুর। ভাঙা বাড়িগুলোর সামনে ফুটপাথের কোল ঘেঁষে দু-পাশেই দুটো বড়ো বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছ। প্রকাণ্ড গাছ দুটো দু-ধার থেকে এসে পরম স্নেহের আলিঙ্গনে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে, বিশাল একটা তোরণ তৈরি হয়েছে। আগুনের ছোপ-ধরা, কচি পাতার চোখ-জুড়োনো সবুজে-ভরা তোরণটা হাওয়ার ইশারায় নাচে। তারই সঙ্গে ছন্দ জাগছে সারা পথের আলো-আঁধারির জাফরিতে। সর সর সর সর করে ভারি মিষ্টি একটা শব্দ হয়।... সহনশীল পিঠ পেতে রাজপথ পড়ে আছে চুপ করে।

ওপাশের ফুটে কালি-লাগা, ধসে-পড়া, হা-হা করা ফাঁকা বাড়ি-দোকানঘর, ঐতিহ্য চুরমার হয়ে-যাওয়া ভগ্নস্তূপ সব। অপরিচিত একটা বস্তি ছিল ওখানে। রাস্তাটা একদম ফাঁকা, মাঝে মাঝে শুধু অস্ফুট শব্দ শোনা যায় কাদের। ওই নিঃস্বতার পটভূমিতে থেকে থেকে মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর পাতলা হাওয়ায় ছোটো হয়ে কানে এসে লাগে।

আজ যখন হঠাৎ দুপুরে ছুটি মিলে গেল, তখন কেন যে আমরা দুজনা এইখানে ফুটের ধারে এসে বসলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার বন্ধু একেবারে চুপ হয়ে পাশে বসে আছে। আমি যখন বললাম— "ওই বস্তিরই একটা ঘরে থাকত আমাদের পরমপ্রিয় ইসরাইল, এতদূর যখন এলাম তখন চলো দেখে আসি তার অবস্থাখানা এখন কী"— ও ভয়ানক চটে উঠল। আমি বলে অত্যন্ত বাজে বকি।

আমি বুঝি। আমার বন্ধুকে আমি জানি। ওই নরম মনের জন্যেই তার মাথায় চেপে এসেছে দুঃখের ভার। সীমান্ত পার হয়ে যারা দলে দলে চলে এসে আমাদের শহর আর তার আশপাশ ছেয়ে ফেলেছে, তাদের চোখের জলে আবার যে আমাদের দেশ চাপা আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠছে, এ-কথা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। আমাদেরই চোখের সামনে আমরা যে দেখছি এ এক আগুন-ফসলের বীজধান বোনা চলেছে— এ-কথা বললেই ও চটে যায়।

ও খালি দুঃখই দেখে, আমার এই বন্ধু।

আজ নিয়ে এল এই পথের ধারে। ইসরাইল থাকতে কতদিন এসেছি। তার ছেলে এমদাদ, কী ছেলে! বাচ্চাটার ছবি আঁকার কী দুরন্ত শখই না ছিল! আর সে শখের জোগানদার ছিল আমার বন্ধু। রঙিন খড়ি কিনে এনে দিত এমদাদকে, সেই ছেলে পরম উৎসাহে দেওয়াল এবং মেঝেতে দাগ কাটত তাই দিয়ে। এই নিয়ে কতবার মার খেয়েছে ইসরাইলের হাতে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একবার তো আমার বন্ধুর সঙ্গেই কাজিয়া বেধে গেল প্রায়, এইসব কুকর্মের উৎসাহদাতা বলে।... কিন্তু হাত ছিল বটে ছেলেটির। হয়তো কত কী-ই হতে পারত, কে তোয়াক্কা রাখে!

চেনা সেইসব মুখগুলোকে কোথাও দেখছি না। ইসরাইল তার পরিবার নিয়ে কোথায় ছিটকে চলে গেছে খোঁজ রাখি না। আজ দেখি, তাদের সবার ভেঙে-যাওয়া ঘরে নতুন এক দল এসে উঠেছে। কারা যেন এদের এনে উঠিয়েছে। এদের রাগকে ভুল পথে চালিত করে সুবিধে যাদের, তারাই হবে। কিন্তু তারা জানে না, এদের পেট বড়ো শিক্ষক। যত জ্বলে মরবে, তত এরা জ্বলার জন্যে তৈরি হবে।

কথাটা শুনে আমার বন্ধু একেবারে খেঁকিয়ে উঠল— “এত বাজে বকো মাইরি। তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি বুঝি এদের দুঃখে খুশি হয়েছ! যে তোমাকে জানে না, সে ঠিক তাই ভাববে।”

এর উদ্ভট পাগলামির সঙ্গে তাল রেখে আর কত চলব? উঠতে যাচ্ছি, একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল।

ইসরাইলকে দেখলাম। দুজনেই একসঙ্গে। স্বপ্নেও ভাবিনি ওকে ঠিক আজকেই এখানে পাওয়া যাবে। ও কিন্তু অবাকই হল না আমাদের দেখে, শুধু কাছে চলে এল। চোখের তলায় ওর কালি পড়েছে, চুলগুলো সোনালি মতো হয়ে গেছে, আর অত বড়ো পাট্টা জোয়ানের গাল দুটো ভেঙে তুবড়ে গেছে। বস্তির ঘরগুলোর দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে। বন্ধু বলে— “কী, তুমি এখনও যাওনি?”

ইসরাইলের নজর কিন্তু সেই ঘরগুলোর দিকে গাঁথা। সে দাঁতের ভেতর থেকে জবাব দেয়— “ওই ঘরটায় আমি থাকতাম। বুঝলে, ষোলো বরস আমার ওই ঘরে কেটেছে।”

আমার বন্ধু আবার বলে— কী, যাওনি কেন?”

“এবার যাব। ভেবেছিলাম কোথায় যাব, সে-দেশে কাউকে চিনি না। পার্কসার্কাসে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার যাব।”

ও একটা নিশ্বাস আটকে চুপ করে থাকে খানিক। আমরা দুজনেই নীরব। মাথার ওপর গাছের পাতার ঝালর দোলে। ওপাশে দু-একটা লোক বস্তি থেকে বেরিয়ে যায়, এক-আধজন ঢোকে। ওদের মুখগুলো এক-একটা ইতিহাস বুঝি।...

আবার ইসরাইল কথা বলে— “আমার বেটাকে মনে আছে তোমাদের, এমদাদকে?”

আছে। এমদাদের সেই একগাদা চুল আর একগাদা দুষ্টুমি-ভরা হাসি কি কখনও ভুলতে পারব?...একবার বন্ধুর দিকে তাকাই, সে মাটির দিকে মুখ করে ধুলোতে ঝরাকাঠি দিয়ে আঁচড় কাটছে। ইসরাইল বলে— “কাল রাতে সে খতম হয়েছে।.. বুঝলে, আমার বেটা এমদাদ, তোমাদের দোস্ত— কাল রাত অনেক ঘড়িতে ওলাওঠা হয়ে মারা গেছে পার্ক সার্কাসের রিফিউজি ক্যাম্পে।”

চোখের কোণগুলো অল্প লালচে, সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।— “কেন মরল ও বলতে পারো?...পারো না।”

কঠিন হয়ে খানিকক্ষণ সে আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁপে কেঁপে ওঠে। মুখটা নেমে যায়। আমার বন্ধু কীরকম যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। অস্থিরভাবে বার কয়েক নড়ে বলে— “ইয়ে, ইসরাইল, তুমি ক-দিন, মানে—”

"খামোশ্।" ইসরাইল গর্জে ওঠে— "ওসব নাকি-কান্নায় আমায় ভোলাতে পারবে না। কী ভেবেছ তোমরা আমাকে? জানো, আমি কে?"

বড়ো বড়ো চোখ করে খানিক আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে সে এক ঝটকায় ঘুরে যায়। দৃঢ়ভাবে কয় ধাপ এগিয়ে তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আবার। ...আমি কাছে গেলাম। পেছন থেকে বললাম— "তোমার খাওয়া হয়েছে? সারাদিন খেয়েছ কিছু?"

ধুলোবালি-লাগা সোনালি চুলসমেত মাথাটা ঝাঁকায় সে।

আবার বলি— "খাবে?"

ও ঘুরল। টলটল করছে চোখে জল!— "আমার মাথার মধ্যেটা কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে ওস্তাদ।"

গায়ে হাত দিলাম। হাতটাকে নামিয়ে ওর মুঠোর মধ্যে নিল। দুবার চাপ দিল। তারপর আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সলজ্জ একটু হাসল। বৃষ্টিতে ধোয়া আকাশের মতো হাসি।

মোড়ের হালুইকরের দোকানে বসে তিনজন খেয়ে নিলাম। যন্ত্রের মতো ইসরাইল খেয়ে যাচ্ছে, একটা কথাও না বলে। আমার বন্ধু বার বার খাবারের গ্রাস হাতে করে ওকে দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। খাওয়া শেষে ইসরাইল যখন হাত ধুতে উঠল, সন্ত্রস্ত হয়ে আমার বন্ধু চেয়ারটা সরিয়ে ওর যাবার জায়গা করে দেয়। মেঝেতে চেয়ারের পায়া-ঘষার একটা বিশ্রী শব্দ হয়। ইসরাইল উঠে দাঁড়ায়। আমাদের দুজনের দিকে অদ্ভুতভাবে দেখে। ঠোঁটটা অতি অল্প ফাঁক হয়ে যায়।— "দোস্ত!"

আমার বন্ধু যেন নিজের মনেই খুশি হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে ইসরাইলকে একবার আদর করে নেয়।... আমরা পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সেই ফুটপাথ আর গাছের তোরণ! ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে গাছের পাতায় দোলানি একেবারে নেই। ভ্যাপসা গরম। আকাশ তামাটে, সূক্ষ্ম ধোঁয়ার আবরণে যেন পোড়া আকাশটা ঢাকা।

কে একজন লোক ওধারে থামের ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে, তার পেছনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এধারে এসে বসার আগেই সে নির্লিপ্ত বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল—

"মনপবনের নাওরে, মনপবনের নাও,
রাঙ্গাবরণ কন্যা যেথায় সেই দেশেতে যাও ॥"

সুর শুনলেই আমার বন্ধুর মেজাজটা ভালো হয়ে যায়। আনন্দিত মনে বলে উঠল—"বাঙালদের এইটেই আমার ভালো লাগে। এত সুন্দর গান করে।"

ইসরাইল আবার কেমন গুম হয়ে গিয়েছিল। বস্তির ঘরগুলোর দিকে তেমনি করে বার বার চাইছিল। এবার বলে বসে,— "দ্যাখো বাবু, সত্যি কথা বলি। ওই শালা আমার ঘর ছিল। ওই ঘরে এতদিন কেটেছে। আজ কে এসে আমার সেই ঘরটাকে

বেদখল করে বসে আছে। আচ্ছা বলো তো, রাগ হবে না আমার? মনে হবে না শালাদের শেষ করে ফেলি?...কিন্তু জানি, এখানে বিচার নেই। তাই পাকিস্তানে যাব।... এই ঘর, এই রাস্তা, এই তোমরা, আর এই সব— ছেড়ে যেতে শিনা দুখাবে না? দুখাবে। কিন্তু ঘর আমার চাই। তাই যাই।"

আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করে—"কে আছে রে ও-ঘরে এখন?"

"কী জানি! তবে যেই থাক, তাকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করতে পারলে তবে শান্তি। সে আমার দুশমন। গোটা দেশটাই দুশমন।"

আমার বন্ধু হঠাৎ বিজ্ঞের মতো বলে— "কে যে দুশমন, সেইটেই তো কথা—"

ওদের গম্ভীর কথার ফাঁকে ফাঁকে অল্প বেসুরো গানটা টানা টানা সুরে কান্নার মতো ভেসে আসছিল, আমার বন্ধু কথা থামিয়ে চুপ করে শোনে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—"সত্যি, গানগুলো ভালো। মনটা উদাস মেরে যায় শুনলে।"

ইসরাইল হাঁটুতে চাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কোনো কথা না বলেই কয় পা হেঁটে চলে যায়। ঘুরে আমরা তাকিয়ে আছি দেখে দাঁড়ায়। নিজের মনেই যেন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়— "না, এমদাদ তসবির খিঁচতে খুব দড় ছিল। মহা দড়। তো, সব ভেঙেচুরে নিয়ে গেছে, কিন্তু দেওয়াল থেকে তার দস্তখত নিয়ে যেতে পারেনি। মাটির দেওয়ালে আঁকা তার নানিজানের ছবিটি। আর সেইবার যে মার দিয়েছিলাম আর একটা এঁকেছিল বলে, একটা রেলের গাড়ি এঁকেছিল,— লাল আর সবুজ আর হলুদ খড়ি দিয়ে।...তোমার তো ভারি দোস্ত ছিল।"

একটু হাঁ করে ও আমাদের দিকে চেয়ে আছে। চোখের কোলে সলজ্জ হাসির আভাস। আমার বন্ধু একটু একটু করে বলে— "এমদাদ ভালো ছবি আঁকত।"

ইসরাইলের মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলে যায়। অন্যমনস্কভাবে শুধু চোখের মণি ঘুরিয়ে আমার বন্ধুর দিকে দেখে, তারপর তাকায় আবার বস্তিটার দিকে। ওর চোখের মধ্যে স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাবনার ছায়া নেমে আসে। আমাদের অস্তিত্ব যেন ও ভুলে গেছে, ধীরে ঘুরে চলে গেল।

গাইয়ে লোকটা ওধারে গাছের ছায়ায় সটান শুয়ে পড়েছে, আর গান করছে না। সূর্য চলে এসেছে পশ্চিমে, বেলা গড়িয়ে দুপুর উতরে যাচ্ছে।... আমি বললাম— "সে তো হল। কিন্তু এলাম কেন এখানে, বসেই বা আছি কেন, কিছুই বুঝছি না।"

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে বন্ধু, তারপর উবু হয়ে বসে অল্প দুলতে দুলতে মাটিতে নখ দিয়ে নকশা কাটে। লেখে— "ইসরাইল"— ল-এর পর দাঁড়িটা জোরে কেটে নখ তুলে নেয়। তারপর বলে— "অনেকদিন পরে ইসরাইলকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করছিল। তার পাড়াটা অন্তত; কতদিন এদিকে আসিনি বলো তো?...নানান ধান্দায় ওর কথা একবারও মনে হয়নি।"

আমার বিশ্রী লাগতে থাকে। এভাবে বসে সারা দুপুরটা কাটানোর কোনো মানেই পাচ্ছি না। মাথা ধরে যাবে ভ্যাপসা গরমে। হঠাৎ আমার বন্ধু আবার বলে— "একটা কথা ওস্তাদ।"

"বলো।"

"ওর বেটা এমদাদকে তোমার কেমন লাগত?"

"ভোলা যায় না। একদিন একটা বড়ো আঁকিয়ে হত।"

"হত, না?" আমার বন্ধু প্রশ্ন-ভরা চোখে আমার দিকে তাকায়— "হত না।... ওকে বিড়ি বাঁধতে হত। কিংবা ওইরকমই একটা কিছু।"

..."আচ্ছা ওস্তাদ!" ঘাড়টা একটু হেলিয়ে ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকায় ও।

"কী? বলো।"

"এমদাদ তো মরে গেল! কফিনের মধ্যে করে ওকে কবরচাপা দেবে। একেবারে শেষ হয়ে গেল ছেলেটা। আর কিছু বাকি নেই ওর, না?"

চুপ করে চেয়ে থাকি ওর দিকে। ও আবার বলে— "আর ও খড়ি চাইবে না আমার কাছে। কারো কাছে কিছু চাইবে না। ওর চাহিদা ফুরিয়ে গেছে।...আচ্ছা, সবারই তো ফুরোবে। আমারও। কোনো একদিন।"

"হ্যাঁ, তাতে কী?" জিজ্ঞাসা করি ওর দিকে চেয়ে।

"না...আমি ওই গাইয়েটার কথা ভাবছিলাম। ওই যে গান করছিল এখানে বসে, শুয়ে আছে। ওর তো একটা চেনা পাড়া ছিল তো।... সেখানকার লোক আর ওর গান শুনবে না। এমন একটা দিন আসবে, যেদিন কেউ শুনবে না। ওর গানের কথার চাহিদাও চুকে যাবে।"

কী বলতে চায় ও, কিছুই বুঝতে পারি না। ও কিন্তু নিজের মনে বলে চলে— "তার মানে মরলেই সব চাহিদা চুকে যায়। পেটের, মাথার, সবকিছুর।... আচ্ছা, এই কথাটা যদি বলি, কেমন হয় ভেবে দ্যাখো ...চাহিদা মেটানোর ভার যাদের, তারা যদি মেটাতে না চায়, তবে তারা কী চাইবে? মরি, এই চাইবে। সবাই মিলে, সব ছবি আর সব গান নিয়ে মরে যাই। বালাই থাকবে না। কী বলো!"

আমার বন্ধুর যুক্তিজাল খুব দামি সুতোয় গাঁথা, আমার তা মনে হল না। চুপ করে চেয়ে রইলাম। ও বলল— "আজ তো সবাই মরছি, মরবই। তার মানে, কেউ চাইছে আমরা মরি। কারা? যারা চাহিদা মেটাবে। কেমন কিনা! এই কথাটা—আরে!"

চমকে তাকালাম ওর কথা শুনে। আকাশটাকে দেখছে ও দাঁড়িয়ে উঠে— আমিও চাইলাম। পশ্চিমের এক কোণে অল্প অল্প কালো মেঘ চুপচাপ হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। নজর তার সূক্ষ্ম ধোঁয়ায়-ভরা তামাটে সারা আকাশের দিকে। থেকে থেকে তার পাঁজর ঘেঁষে সাদা হয়ে উঠছে, বাজের আলো। দূর থেকে চাপা গমগমে আওয়াজ ভেসে আসছে, লাফ দিয়ে পড়ার আগেকার বাঘের ডাকের মতো। ওই দিকে তাকিয়েই আমার যেন চোখ জুড়িয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল। স্নিগ্ধ বৃষ্টির নিশানা আসছে।...

আমার বন্ধু গুম হয়ে খানিক চেয়ে থাকে সেদিকে, ওকে যেন হতাশায় ছেয়ে ফেলেছে। আমার মনটা কেমন দমে আসে ওর ভাবসাব দেখে। হঠাৎ আমার বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। চোখ দুটো চকচক করছে চাপা উত্তেজনায়।— "ওস্তাদ।"

"কী"?

ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, তার পর বলে— "এমদাদের হাতের কাজগুলো দেখবে? চলো।" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

সেই চেনা বস্তির ঘর। গলিটা একদম ফাঁকা। মোড় ঘুরতেই অল্প গলার আওয়াজ পেলাম। তাকালাম। আমার বন্ধুর অবাক চোখ বড়ো বড়ো হয়ে আসে। আমরা আর এগোই না।

ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। ইসরাইল আর একটা বুড়ি। বুড়িই বটে, পাকা আমের কুঁচকে যাওয়া পরিপূর্ণতা ওর বলিরেখাঙ্কিত মুখে। চোখ দুটোতে আমি বুঝি হঠাৎ অনেকখানি বড়ো পদ্মা নদী আর উধাও হু হু বাতাসের আভাস পেলাম। ছেঁড়া নোংরা শাড়ির প্রান্ত দিয়ে বারবার নাক মোছে, এয়োতির লক্ষণ লালপাড় শাড়ি! কপালেও আবছা সিঁদুরের দাগ।

ইসরাইলের সেই ঘর। এমদাদের হাতের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে যার দেওয়ালে। ইসরাইল তার নিজেরই ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ধুলোগুলো একটা কাগজে জমা করছে এখন, আর বুড়ি চৌকাঠের গায়ে পা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ইসরাইল বলে— "তোমার তোরঙ্গ-প্যাঁটরা সবই তো গুছিয়ে দিলাম বুড়ি, ঘরও সাফা করে দিলাম। তো ঘরে ঢোকো এবার, আর বসে কেন?"

বুড়ি আমতা আমতা করে বলে— "না, উবগার যা কইরলা বাবা, তা ত—। মাজাটা ভাঙা। কাজ করনের শক্তি নাই। এই আমিই কিন্তু আছিলাম এককালে, সাতখান গাঁয়ে সাঁফল্যার জগৎ বামনির নাম করতে চিনত। তোমরগা পূজায় বলো, পাব্বনে বলো ব্যাপারের বাড়িতে বলো, এই আমি। লোকে কইত জগৎ বামনি দশভুজা। তা—"

ইসরাইল চট করে বলে ওঠে— "তা তোমার ঘরটা তো এক রকম হল, এবার আমি যাই।"

বুড়ি ওর দিকে কেমন করে যেন তাকায়, তারপর হেসে ফেলে মাথা নামায়— "কী হইয়া গেছি অভাবের তাড়নে!" মুখ তোলে— "খাওয়াইবা কইলা না বাপ, ক্ষুধা যে বড়ো!"

"ও— হ্যাঁ।" ইসরাইল লজ্জিত হয়ে পড়ে— "মানে, আমার কাছে আর পয়সা নেই!...তা, যাবে আমার সঙ্গে বাইরে? আমার বন্ধুরা বসে আছে রাস্তায়, ওদের কাছ থেকে পয়সা নিতে হবে।"

"চলো। না খাইলে আর পারি না। চাউল নাই, পয়সা নাই। লাতিটা বারাইছে, ঘুরতেছে কীসের ব্যাভ্রমে। গান-পাগলা ছাওয়াল।"

বুড়ি উঠে আসে। ইসরাইল দরজা বন্ধ করছিল, বারণ করে।

"ও আউজাইয়া আর কী হইব? ব্যাঙের আধুলি! কীই বা আছে আর!"

দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিতে গিয়ে দরজার পাল্লার ওপর বিবর্ণ কয়টা দাগ দেখেছিল ইসরাইল। তাদের ওপর দিয়ে আলগোছে আঙুলের ডগাগুলো বোলায়, করে

খড়ি দিয়ে একটা মানুষ আঁকার চেষ্টা হয়েছিল।...ও ঘোরে— "তাহলেও তোমার ঘরটা তো খুলে রেখে যাওয়া যায় না।" অদ্ভুত ওর চোখ দুটোর ভাব, আমি এতদূর থেকেও দেখতে পেলাম।

বুড়ির মুখ বেঁকে আসে— "ম্যাগো, কী আমার ঘর!...তোমারে তো কইছিই বাবা, এই ঘর আমার পছন্দ না। কেমুন বা বেশ পদ্মনকশা-করা দরজাখানা আছিল, কেমুন বা আঙনাখান,...মানে, বোঝাই ক্যাম্‌নে আমার ঘরের বেত্তান্ত, আর বোঝেই বা কেডা—"

"আচ্ছা, আচ্ছা চলো।" ইসরাইল সন্তর্পণে ওকে ধরে নিয়ে এগোয়। বুড়ি এক পা গিয়েই মুখ উঁচু করে তাকায় ওর দিকে। "বাবা, তোমারে দেইখা আমার বা কার জানি কথা মনে জাগে। কে জানি ধইরত ঠিক এমনি কইরাই। কে—"

"বেশ, বেশ, চলো এখন।" তাড়া লাগায় ইসরাইল। বুড়িটার দিকে আর যেন ও তাকাতে পারছে না। কিন্তু সামনে তাকাতেই আমাদের দুজনের সঙ্গে ওর মুখোমুখি হয়ে গেল।

লজ্জায় মুহূর্তের মধ্যে অত বড়ো জোয়ানটা কুঁকড়ে কতটুকু হয়ে যায়। বুড়ির কাঁধ থেকে ওর হাত অজান্তে সরে যেতেই সেও তাকায় আমাদের দিকে, তারপর সভয়ে তার চওড়া বুকের কাছ ঘেঁষে যায়। শঙ্কা-ভরা চোখ তুলে তাকায়। ইসরাইল অভয় দেয়— "আমার বন্ধু ওরা।...ইয়ে, কীবে, এখানে?"

আমার বন্ধু এগিয়ে গিয়ে বলল— "ওর কাছে পয়সা আছে, নাও।"

ইসরাইল আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমার বন্ধু ভালো করে দেখে ফিক করে হেসে দিল। বুড়িরও ফোকলা মুখে এক গাল হাসি জাগে। ভ্যাপসা গরম হতাশার মধ্যে যেন এক ঝলক হাওয়া ঝিলিক দিয়ে গেল।...আমার বন্ধু বন্ধুত্ব পাতাতে ভারি পটু।

রাস্তায় পড়ে ইসরাইল চাপা গলায় আমাকে বলে, আর আমার বন্ধু বুড়িকে নিয়ে একটু পেছনে আসে।— "মাপ করো একটু দোস্ত। বলেছিলাম না, আমার ঘরে যে আছে তাকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করতে না পারলে আমার সোয়াস্তি নেই— তখন জানতাম না এই শালি বুড়ি ওখানে আছে।"

বড়ো রাস্তা দিয়ে আমরা তোরণটার কাছে এসে পড়লাম। ইসরাইল বলে— "বুড়ির এক নাতি আছে, ষোলো বছরের জোয়ান নাতি।...আঠারো জনের সংসার খান খান হয়ে গেছে। কতক মরেছে, কতক কোথায় পালিয়েছে কেউ খোঁজ রাখে না। খালি এই দুটো এখানে এসে ঠেকেছে।... এখানে এরা কিন্তু থাকতে চায় না, পদ্মার কিনারে কোথায় ঘর, সেইটে—"

কথা থামিয়ে ও ঘুরে তাকায়। ওর চোখে দরদ এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভারি সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। দুনিয়ার যত রূপ ওর মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছে। ও ভালোবেসেছে।

...দূর থেকে মৃদু স্বর শুনে তাকিয়ে দেখি সেই গাইয়ে লোকটি শুয়ে শুয়েই গানটা আবার ধরেছে— "ও মনপবনের নাও..."

আমার বন্ধু বুড়িকে নিয়ে পৌঁছে গেল, ভারি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তাদের। সে প্রশ্ন করে— “কোথায় বাড়ি তোমার মাগো?”

“আরে বাপরে, ইসে, সেইডাই প্রশ্ন। প্রশ্ন তো সেইখানে। কনে বাড়ি মোর, কইবার পারো?... পারো না। গোলকধাঁধার বাবা ধাঁধা ইডা। ই হল স্যান্—”

কথা অসম্পূর্ণ রেখেই বুড়ি ফিক ফিক করে হাসে। অপর চোখটা কুঁচকে একটু বলে— “পদ্মা নদীর বিলাতিপানার ঘর কনে? কোহান্ লিয়ে যায় সেখানে?”

ইসরাইল আর আমার বন্ধু একবার চোখাচোখি করে। তারপর ইসরাইল বলে— “তোমার লাতি করে কী?”

“গান।” বুড়ি চোখ বোজে। “বড়ো ভালো। কত গান গাইত কত্ত গান...শুইন্‌ছনি? ওই।”

আমরা কান পাতি সবাই। তরুণ কণ্ঠে গানটা যেন এখন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দূর থেকে ভেসে এলেও তার তেজ পরিষ্কার বোঝা যায়। সে গাইল—

...“রাঙ্গা সূর্যি উঠে সেথায় রাঙ্গায় তামান্ পানি,
রাঙ্গা আকাশ তলে তাহার রাঙ্গা মরমখানি।
—রাঙ্গা নদীর পথ ধইরা সেই মোহনায় বাও,
ও মনপবনের নাও।”

ঘুরে ফিরে গায়কটি গানের প্রথম কলি গাইছে, মুর্ছে পড়ছে নতুন বুকের সবখানি জমাট প্রেম।...লাল ছটায়-ভরা আকাশের তলায় রাঙিয়ে রাঙিয়ে ওঠা মহান পদ্মা নদীর সবখানি উদারতা, সবখানি বিশালতা ওই গানের পথ বেয়ে বেয়ে আমাদের মাঝখানে চলে এল।...

বুড়ি বলে ওঠে— “বাবা সকল, আসল কথাখান্‌ই যে বড়ো ভুইলতে আছ? খাবার কই?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ।” ইসরাইল দম চাপে— “পয়সা দাও ওস্তাদ।”

পকেট হাতড়ে কয় আনা বের করে দিলাম। ইসরাইল চলে গেল খাবারের দোকানটার দিকে। আমার বন্ধু আর বুড়ি পাশাপাশি বসে, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।

এত কথাও বলতে পারে বুড়ি, একধার থেকে বলে। আমার বন্ধু বসে বসে পা চুলকোয়, আমি শুনি। বুড়ির কথায় কথায় সেই কোন এক গাঁয়ের ছবি ফুটে ওঠে। নিজেই সৃষ্টি করে রস, নিজেই হাসে, নিজেই ছলছল চোখ করে চুপ করে থাকে। এরই এক ফাঁকে ইসরাইল শালপাতার ঠোঙায় করে কিছু খাবার নিয়ে এল। খানিক খেয়ে বুড়ি আঁচলে বেঁধে রেখে দিল, গাইয়ে নাতির জন্যেই বোধ করি। তারপর নিশ্চিন্দি হয়ে পা ছড়িয়ে বসে পায়ে দু-হাত বুলোয়। তার নেশাটি ঠিক আছে আজও, খুঁট থেকে আল্‌াপাতা বের করে মুখে দেয়। তারপর আবার ধরে কথা। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, বলেই চলেছে ভিটের বৃত্তান্ত। আর ওর নাতিটির বোধ হয় পদ্মা নদীর গান গাইতে সমান উৎসাহ।

...সেই কতদূর, আমরা সেসব দেশে যাইনি, ওর ভিটেটা ছিল। যেখানে রোজ সাঁঝ-বাতি জ্বালত সেই লেপা আঙিনায় তুলসীতলা ছিল।— আর সবার ওপরে ছিল এক চালতা গাছ। চালতা গাছের কথা বলতে বলতে বুড়ি প্রায় পাগল হয়ে উঠল। বাড়ির এক কোণে বাঁশঝাড়ের ধারে, যেখানে গেলেই সোঁদা সোঁদা পচা পাতার গন্ধ নাকে এসে ঠেকত, চাঁদনি রাতের নিশিতে-পাওয়া আঁধার যেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমে থাকত, আম-জাম-কাঁঠালের ছায়া দিয়ে-ঘেরা জায়গাটুকু,— সেইখানেই ছিল তার কত সাধের চালতা গাছ। আহা, কী চালতা গাছখানরে।...এখন হয়তো কত চালতা সেখানে ধরে আছে,...দিনমান ঝুলে থাকে, কেউ দেখারও নেই, কেউ শোনারও নেই। মাঝরাতে নিশাচর পাখিরা হয়তো ডানা ঝাপটায় সেখানে বসে, আর ঝুপঝাপ করে চালতা পড়ে। নিথর রাতের সেই শব্দ আমি পরিষ্কার অনুভব করলাম।...এখন চালতাগুলো হয়, আর পড়ে। হয়, আর ঝরে ঝরে পড়ে।...কলকাতায় চালতার কত দাম!

হঠাৎ বুড়ি আকাশের দিকে চায়। বিকালের পড়ন্ত রোদের আকাশ প্রায় ঢেকে এনেছে কালো কালো আকারহীন মেঘ। সীমানাগুলো তার মোটেই পরিষ্কার তীক্ষ্ণ নয়, কেমন যেন মিলিয়ে যাওয়া। বিশাল সেনাবাহিনীর মতো মেঘের পর মেঘ এগিয়ে আসছে। যুদ্ধের বাজনা বাজছে সারা আকাশময়। সারা আকাশময়... বিদ্যুৎ খেলে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে, বিজলির আলোয় মেঘের কোলকে জ্বালিয়ে তুলে।

বুড়ি গালে হাত দেয়।— "ও মা কালবোশেখি যে ঘনঘটা কইরা আইল। ও বাবা, দে-না রে আমারে ঘরে তুইলা। দে বাবা!"

ইসরাইল ওঠে ; ওর হাত ধরে যায় খানিক দূর, তারপর ঘরে বুঁদ হয়ে বসে-থাকা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যায়ও থমকায়। আবার ঘুরে বুড়িকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।...বুড়ির নাতির গানটা টেনে টেনে চলতেই থাকে!

আমি বললাম—"ওঠো। ঝড়বৃষ্টি এসে গেল, আর বসে কী হবে?"

"উঁ"— অন্যমনস্কভাবে ও তাকায়— "নাঃ। চলো।"

উঠে দাঁড়াল আমার বন্ধু। বজ্রমুঠিতে আমার হাত চেপে ধরল। উত্তেজিত গলায় বলল— "ব্যস্।...ঠিক আছে। এক কাজ করি। আমার যত বন্ধু আছে সবার বাড়িতে বাড়িতে যাই। তা হবে কম না আমার বন্ধু। বুঝলে, সবাইকে এককাট্টা করে ফেলি এইসবের মধ্যে দিয়েই..." ও চিন্তিত হয়ে পড়ে— "মানে, এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে হদিশটা বেরিয়ে যাবে। যাবেই।...ঠিক দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু পথ হয়তো আছে।"

নিজের মনেই যেন ও ওজন খুঁজে পায় না, নিজের কথার দু-বার মাথা চুলকে নেয়।

তারপর আবার বলে— "মাথায় শালা পোকা বের হয়ে গেল ভেবে ভেবে।..কিন্তু সব চাহিদা মেটানোর একটা রাস্তা... নাঃ ওস্তাদ, কী জানি।"

মনমরা হয়ে গেল ও। আমি কিন্তু খুশি হয়ে উঠেছি। রাজ্যের হাওয়া এতক্ষণ কোথায় বসে পরামর্শ করছিল, এবার ছুটে এসে আমাদের চুমু খেয়ে গেছে। একরাশ জোলো হাওয়া।—

গানটির সুর তখনও ঘুরে ফিরে বাজছে। দু-পাশের ইতিহাসে ভরা ফুটপাথ ছেড়ে আমরা রাস্তার সুডৌল পিঠে এসে দাঁড়ালাম। তেতে আগুন হয়ে আছে রাস্তা। গাছের তোরণের আওতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। দিনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে আকাশের নিচু হয়ে-আসা মেঘের ঘোমটার তলে। চাপা একটা জ্যোতিতে যেন ভরে গেছে আশপাশ। খুব ভালো করে মাজা কাঁসার বাসনের গায়ের চাকচিক্যের মতো চাপা জ্যোতি।

...তারপর বৃষ্টি নামল।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। সে-আওয়াজের তলায় কোথায় তলিয়ে গেল একলা তরুণ কণ্ঠের গান, অনুভব করলাম হাজার কণ্ঠে কারা যেন গানটা ধরে নিয়েছে।...

আমার বন্ধুর ঘামে-গরমে হাঁপিয়ে ওঠা শরীরের ওপর বৃষ্টি পড়তেই ও ভারি খুশি হয়ে উঠল। হঠাৎ নাক চোখ মুখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে, ও তলের ঠোঁটটা একটু এগিয়ে দিয়ে শব্দ করে মুখে জল টেনে নিতে থাকল। আকাশে বাজনা জোর হয়ে উঠল, মাটিতে বাজনা তার দোঁহার হল। ও পেছনে দেখে, বলে— "দ্যাখো, দ্যাখো!"

কী দেখব? ঘুরলাম। কৃষ্ণচূড়া গাছের তোরণ পাতায় পাতায় নেচে উঠছে, ফুলে ফুলে নেচে উঠছে। বৃষ্টির সাদা পর্দার আড়ালে কত মানুষের কত দুঃখ বীরত্ব হয়ে উঠছে।

আমার বন্ধু মহানন্দে মাথার ওপর হাত চালিয়ে চুলগুলোকে লেপটে সামনে করে দিল। খানিকটা জল চুঁইয়ে পড়ে গেল। ও বলল— "দেখছ না?...শুনছ না? রাস্তায় কান পাতো!"

ও নিজেই হাঁটু গেড়ে বসে রাস্তায় কান পাতল। মুখ বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল— "দ্যাখো, মনে হচ্ছে কত মানুষ কঠিন পায়ে হেঁটে আসছে,...হাসছ? কান পাতো, নিজে কান পাতো বড়ো বাজে বক তুমি!"

বৃষ্টির মোটা মোটা ছাঁট মসৃণ রাজপথের ওপর পড়ে ছিটকে যাচ্ছে। তাদেরই সঙ্গী হয়ে আমি মাটিতে কান পাতলাম।

গুম গুম গুম গুম গুম গুম গুম গুম গুম গুম...

একতালে এগোচ্ছে কত মানুষ।

নতুন সাহিত্য প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ / পৃষ্ঠা ৪১-৪৯

প্রেম

সে এল। সামনের তমাল গাছটা ঝোড়ো বাতাসে দৈত্যের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিল আর পাশের সুপুরি গাছটা মাটির উপরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল।

পদ্মা। শীতের পদ্মার সমস্ত বালুকণা উঠে এসে নাক চোখ কান বন্ধ করার উপক্রম করেছে। শব্দ সে যে কী অপূর্ব, হাওয়ার যে নিজস্ব একটা চরিত্র আছে এটা পদ্মাপারে একা চাঁদ জ্যোৎস্নায় বসে অনুভব না করলে বোঝা যায় না।

তার মধ্যে সে।

এ-আসা যে কী সেটা বোঝানো সম্ভবপর নয়। লোকটি পদ্মার পারে বসে ওপারের তীরভূমি দেখত, কখনো দেখাও যেত না— ওইদিকের মেঘগুলোকে মনে হত যেন কোথাকার দূরদেশের মন্দির। শাঁখঘণ্টার শব্দ শুনতে পেত। ধূপের গন্ধ নাকে লাগত। সে তন্ময় হয়ে যেত, এই অবস্থাতে সে এসে দাঁড়াল।

সামনে সুপুরি গাছটা তার পাগলামি চালিয়েই চলেছে। তমাল গাছটারও বদমায়েশির সীমা নেই। ঘোর ঘনঘটায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হাওয়া পড়ে এল। এবার জল নামল বলে। মাঝিরা পদ্মায় পাল গুটিয়ে কেনোরকমে পাড়ের দিকে ভিড়াবার চেষ্টা করছে তাদের নৌকো। মহাজনি ভরগুলো নিজেদের দেহ নিয়ে সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না। পানসিগুলো কোনোরকমে ভেতরে ভিড়ে যাবার চেষ্টা করছে। দাঁড়িগুলো দাঁড় টানতে গিয়ে পদ্মা-মার স্রোতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারছে না, হালি হাল সামাল দিতে গিয়ে নিজেই বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। পাড়ে ফাট ধরেছে। চিরচির করে কালো একটা রেখা মাটির বুকের উপর দিয়ে নিজেকে এঁকে যাচ্ছে। তার পরেই ঝপাং ঝপাং ঝপ্ মাটি ধসে পড়ছে। পদ্মা-মা নিজের স্রোত বদল করছেন।

সেদিন ছিল এমন একদিন।

পদ্মার বুকে উত্তাল কামনা। পদ্মা এদের রক্তে রক্তে অস্থিমজ্জায়। এদিকে আবার একটা দামাল হাওয়া প্রচণ্ড বাঁদরামি শুরু করে বালুগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে অভ্রের চিকচিক ব্যাপারটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তখনও তমাল গাছটা গণ্ডগোল করছেই। আর সুপুরি গাছটা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেই। আর এরা দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটা মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। ভাবল কত পবিত্র কত জীবন্ত এই মুহূর্তটা। এই যে উদার পদ্মার পাড় হাওয়া প্রকৃতির সমস্ত অবদান। এটা এ মুহূর্তে। এটা তো পরের মুহূর্তে আর থাকবে না। সেই মুহূর্তে মেয়েটি হেসে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আর বলল, "তোমার জন্যই এসেছি এই ঝড়ের রাতে।"

ও তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল, তারপরে মেয়েটির নিজের সুগন্ধি চুলগুলো দিয়ে মেয়েটিরই গলা পেঁচিয়ে ধরল এবং মেয়েটাকে মেরে ফেলল, ভাবল এই মুহূর্তটা অক্ষয় হোক। এরপরে এও তো বুড়ো হয়ে যাবে। আমারও জীবনে বিভিন্ন ঘটনা

আসবে। কিন্তু অক্ষয় অব্যয় মুহূর্তটি আর কোনো দিন জীবনে ফিরবে না। এর স্মৃতিটুকুকে মলিন হতে দেওয়া যায় না।

ও মেয়েটির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বাইরে তমাল আর সুপুরি গাছ দাপাদাপি করছেই। পদ্মা তার নিজের মনে চলেছে। ঝড় পড়ে এলো।

মধ্যাহ্ন ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫

ঝংকার

তিনি পালিয়ে এসেছেন। গভীর জঙ্গল, সামনে পাহাড়ের খাদ বেয়ে বইছে, তারই ধারে একটা কুঁড়ে তৈরি করে উনি ধ্যানমগ্ন আছেন। সরস্বতী বীণ কি করে আবার খুঁজে পাওয়া যায়। সেই তার সাধনা।

মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে, অনেক আঘাত পেয়ে তিনি মদ এবং ধীশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে কোথাও বোধ হয় ওঠার চেষ্টা করছিলেন। তাই সমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করল, সংসার তাঁকে পরিত্যাগ করল, পরমপ্রিয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করলেন, দেবশিশুর মতো ওঁর নিজস্ব সন্তানগুলি পরিত্যাগ করল এবং উনি এই জঙ্গলে মনুষ্যবহির্ভূত একটি কুটিরে এসে আশ্রয় নিলেন।

সুরের ধ্যানই হচ্ছে ওঁর ধ্যান এবং ওই সুর যে-মন্ত্রে বেরোতে পারে সেই সরস্বতী বীণ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে থাকলেন, নানারকম যন্ত্র ঠুকঠাক করে হাতুড়ি পিটে ঘষেমেজে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন উনি রাগ করে যন্ত্রটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল।

সেদিন বর্ষার রাত। মাথায় ঘুরছে খালি মধ্যম-রেখা আন্দোলন। উনি দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন আর মাঝে মাঝে মদের পাত্রটা থেকে একটা করে চুমুক দিচ্ছেন। এই সময় হঠাৎ কোথা থেকে পাখিরা গান গেয়ে উঠল। গভীর সংগীত শোনা গেল, তারপরে উনি মুখ তুলে দেখলেন সামনে অপূর্ব একটি মহিলা। তিনি শুভ্রা, শ্বেতবসনা, হংসবাহিনী, কমললোচনা। তিনি হেসে বললেন— "তুমি আমার প্রেমিক, এসো আমরা প্রেম করি।"

এই গভীর অরণ্যে যেখানে নারীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেইখানে এমন অপরূপা তিলোত্তমা মহিলা কোথা থেকে এলেন, এটা বিবেচনার বস্তু। বাইরে বিজলির ঝলক কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পৃথিবী শান্ত স্তব্ধ হয়ে এল। ঝিঁ ঝিঁ ডাক আস্তে আস্তে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মাঘী পূর্ণিমার চন্দ্রিমা কোথা থেকে উদিতা হলেন, চারপক্ষ যেন গুটিয়ে আসতে থাকল।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

মহিলা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন "বীণটা তোলো।"

উনি বললেন, "এ তো সরস্বতী বীণ, হারিয়ে গেছে, এই তো খুঁজছিলাম।"

মহিলা বললেন, "আমার হাতে দাও।"

তিনি দিলেন।

মহিলা সেটিকে নিজের হাতে নিয়ে এক অপরূপ লীলায়িত ছন্দে গ্রহণ করে একটি

ঝংকার তুললেন। একটি ঝংকার।

অপরূপ সব শুভ্র।

জগৎ এইখানেই শেষ।

মধ্যাহ্ন ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫

মার

দ্বারকাপুরী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুভদ্রার নিমিত্ত প্রার্থনা মন্দিরে গিয়ে হাজির হইলেন। সুভদ্রা তখন তার শুচিশুভ্র হাতদুটি জোড় করে পরমব্রহ্মের চিন্তায় ধ্যাননিমীলিতা ছিলেন। চারিপাশে যদুকুলবংশীয় মহাকুলবৃন্দ।

হলায়ুধ বলরাম জমিকর্ষণে ব্যস্ত। ধরিত্রী মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ আহরণে ব্যাপৃত। শ্রীকৃষ্ণ মিটিমিটি করিয়া চাহিয়া আছেন। আর দ্বিরথধারী অর্জুনকে অতি গূঢ় নির্দেশ দিতেছেন : ব্রহ্মার মন্দিরে আরোহণ করো।

সুভদ্রা তখন প্রণাম শেষ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছেন। এমন সময় দ্বারে কোমল করাঘাত। সখীরা সচকিত হইয়া উঠিল। সুভদ্রার দুই রক্তোৎপল কর্ণে হস্তপ্রদান করিয়া তাহার শ্রুতিবোধের বাহিরে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু তবু সুভদ্রা সেই হস্তাঘাতের মর্ম অনুভব করিলেন।

তিনি ঝটিতি উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন : কার করাঘাত? সখীরা কহিল : উহা কিছু না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এইরকম শব্দ হইয়া থাকে।

সুভদ্রার তীব্র নাসা স্ফুরিত হইয়া উঠিল। ভ্রুকুটি বিভঙ্গে তিনি কহিলেন : আমি জানি। তাই আমার কাছে অনৃত কথা কহিয়ো না। তিনি আসিয়াছেন, আমি যাইব।

ওইদিকে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ তাহার শিখীপাখাসংযুক্ত শির হানিয়া অর্জুনকে কহিতেছেন বৎস, ধৈর্য ধারণ করো। চিরকালের যোদ্ধা অর্জুনের কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গাণ্ডীবে একটি টংকার ছাড়িলেন। যদুকুলবান ভয় পাইয়া গৃধ্রস্বরূপ পলায়ন করিয়া হলাকর্ষণ ক্ষেত্রে শ্রীবলরামের প্রতি গিয়া নিবেদন করিলেন যে সুভদ্রা অপহৃতা হইতেছেন।

ইহার মধ্যে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। সুভদ্রা অর্জুন-পদ্মলোচন দেখিয়া প্রায় মূর্ছিতা। কী করিবেন তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সখীবৃন্দ তাহাকে ধরিয়া দ্বারকাপুরীর দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার যাইবার ক্ষমতা নাই।

অর্জুন কহিলেন : রথে উঠো। কৃষ্ণ, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের কর্মকর্তা, শুধুমাত্র একটু হাসিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে ঠেকাইলেন না। যেমন যেমন অর্জুনদেব সুভদ্রাকে দ্বিরথে উঠাইয়া প্রবলবেগে রথচালনা করিলেন, তেমন তেমন যাদবগণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে স্বয়ং স্বয়ম্ভূ-স্বরূপ হলায়ুধ হাতে হল লইয়া পশ্চাদ্‌ধাবন করিতে লাগিলেন।

আজিকার ভাষায় বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ একটু মুচকাইয়া হাসিয়াছিলেন। অর্জুনের প্রতি শর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সুভদ্রা যিনি বীরভোগ্যা, যিনি এই ধাত্রী বসুন্ধরা,

তিনি কহিলেন : উহারা শর নিক্ষেপ করিতেছে। হে প্রভু, হে পার্থ, রথের রশ্মি আমার হাতে দাও। ইহাদিগকে তুমি মোটামুটি সামলাও।

অর্জুন সুভদ্রার হাতে তাহার নীল, শীল ও শৈল, শীল দুই অশ্বের দায়িত্ব দিতেছেন।

সুভদ্রা কহিলেন : আমি অশ্ব চালাইব। তুমি তোমার গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করো তো।

তাহার পর যা দৃশ্য হইল তাহা ভুলিবার নহে। রথ অন্তরিক্ষে উঠিল। সুভদ্রা সারথি, অর্জুন পশ্চাৎ সন্ধানকারী। সমগ্র যাদবকুল সংবৃত এবং সংহৃত করিয়া অর্জুন সুভদ্রাকে গান্ধর্ব বিবাহের জন্য লইয়া গেলেন। যাহার ইতিহাস সপ্তব্যূহ গৃহে অভিমন্যু-কাহিনীতে আমরা জানিতে পারি। এই প্রেমের কোনো তুলনা নাই। কৃষ্ণ তাহার চিরকালের দুষ্টামিযুক্ত মিষ্ট হাসিতে লাগিলেন, তখন হলায়ুধ চটিয়া কাঁই হইলেন।

এই হচ্ছে মোটামুটি পৃথিবীর চেহারা। বিশেষ করে বাংলাদেশের। আমাদের বাপ-জ্যাঠাদের অনেক সুবিধে ছিল যে এই সমস্ত রূপকের দ্বারা ব্যাপার জমাতে পারত। কিন্তু আমরা এখন এমন একযুগে জন্মেছি যে এটা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি।

সোজা মার। মার না দিলে ব্যাপার জমবে না। রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে কীট প্রবেশ করেছে এবং আজকের ১৩নং নেবুতলা লেনের অর্ধভুক্ত বৌমাটিকে দেখলে যার সুভদ্রার কথা মনে হয় না— সে মানুষ নয়।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী সাহেবের যে একটা কথা ছিল না— সেই Tradition সমানে চলেছে— সেটা বোঝার ক্ষমতা যার থাকবে সেই বুঝবে। এইসব রূপকের মধ্য দিয়ে চিরকাল আমাদের ভারতবর্ষ বেঁচে থাকবে। আমাদের মা-বোনেরা সেই সুভদ্রা এবং তাদেরকে, সেই রূপকে, গ্রহণ করার ক্ষমতা যাদের আছে তারা বুঝবে যে এই লড়াইটা এখনও শেষ হয়নি, কারণ বহুধাবিভক্ত এই আমাদের বাংলাদেশে, এখানে এইসব রূপকাশ্রয়ী কথাগুলি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সেটা করার জন্য একটা মারধরের প্রশ্ন আছে।

আজকের বাংলাদেশের চারপাশে যা দেখা যায় সেরকম সুভদ্রা কোথায় হবে, সেরকম অর্জুনদেব কোথায় হবে। কিন্তু নিশ্চয় এরা বাংলাদেশে আছে। তারা হবে আমাদের উত্তরপুরুষ।

অভিমন্যুর মতো মায়ের গর্ভ থেকে তারা চক্রব্যূহ ভেদমন্ত্রের কৌশল শিখেছে। এবার এরা মেরে ফাটিয়ে দিক। এদের ফাটানোর একটা ব্যাপার এসে গেছে। সামনের রক্তিম শিমুল গাছটা মোটামুটিভাবে সেই কথাই বলছে।

মধ্যাহ্ন ৪র্থ বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬

মার গল্পের প্রেরণায় সোমনাথ হোড়ের কলম :—

[১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি কুতুবদিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে তখন ঘোর বর্ষা। কমরেড ধীরেন শীলের সঙ্গে কৃষক এলাকা ঘুরে দেখছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম— লাঙ্গলের

একদিকে গাই অন্যদিকে কিষানি ; লাঙ্গল চালাচ্ছে কিষান। ধীরেন বললেন— এই আমাদের কৃষক জীবন। 'মার' গল্প পড়ে মনে হল— কিষান-কিষানির ভূমিকা পালটে দেওয়া যায় না কি?

কিষানিরূপা সুভদ্রার সারথ্যে অর্জুন অমিতবিক্রমে ভূমি কর্ষণ করছে— বীজসিক্ত করবে। ছবিটিতে মূল গল্পের সরাসরি মিল নেই ; তবে অবচেতনে মিল থাকতেও পারে।

সুভদ্রা, অর্জুন এবং পাচনি হাতে অভিমন্যু— কে রোখে এই জোট!

'মার মার'।]

ঋত্বিক ঘটকের গল্প

